ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য

মোহাইমিন পাটোয়ারী

আপনি কি জানেন একফালি কাগজ কিভাবে এত গুরুত্বপূর্ণ হলো? অর্থনৈতিক বৈষম্য লাগামহীনভাবে বেড়ে যাচ্ছে কেন? আর কেনই বা উন্নত বিশ্ব এত ঋণগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে। প্রশ্নগুলো খুব তাত্ত্বিক এবং বিচ্ছিন্ন বলে মনে হতে পারে। অথবা মনে হতে পারে এগুলো জানা কি আমাদের খুব প্রয়োজন? আসলে প্রশ্নগুলো মোটেও বিচ্ছিন্ন কিংবা তাত্ত্বিক নয়; সম্পূর্ণ জীবন ঘনিষ্ঠ এবং একই সুতোয় গাথা বাস্তবতা। আমাদের জীবনে নিয়মিত গভীর প্রভাব ফেলা এই না-দেখা বাস্তবতাগুলোকে ছোটছোট গল্পের আকারে সাজিয়ে সবার কাছে সহজভাবে তুলে ধরতে রচনা করা হয়েছে এই বই।

বইটিতে গ্রন্থাকার আমাদের এই নাজানা বাস্তবতাকেই গল্পের মতো প্রাণবন্ত এবং ছবির ন্যায় রঙিন করে ফুটিয়ে তুলেছেন।

[illegible] । ধ্রুব এষ

ব্যাংকব্যবস্থা
ও
টাকার গোপন রহস্য

ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য

মোহাইমিন পাটোয়ারী

ঐতিহ্য

ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য
মোহাইমিন পাটোয়ারী

প্রকাশক
ঐতিহ্য
রুমী মার্কেট ৬৮-৬৯ প্যারীদাস রোড
বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

পরিমার্জিত তৃতীয় মুদ্রণ
জুন ২০২২

প্রকাশকাল
ফাল্গুন ১৪২৮
ফেব্রুয়ারি ২০২২

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
ঐতিহ্য মুদ্রণ শাখা

মূল্য
তিনশত টাকা

BANKBABOSTHA O TAKAR GOPON ROHOSSO
by Mohaimin Patwary
Published by Oitijjhya
Date of Publication : February 2022
Refurbished Third Print : June 2022

E-mail: info.oitijjhya@gmail.com

Price: Taka 300.00 US$ 10.00
ISBN 978-984-776-804-5

উৎসর্গ

Paul Grignon
যিনি বর্তমান সমস্যাগুলোকে চিত্রায়িত করেছেন
এবং
Satoshi Nakamoto
যিনি এই সমস্যাগুলোর সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন

লেখকের কথা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে William T. Still-এর প্রামাণ্যচিত্র 'The Money Masters' দেখার সময় নিচের উক্তিটি আমার চোখে পড়ে :

> *'It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.'*
>
> *'এটা স্বস্তিকর যে, দেশের জনগণ ব্যাংকিং এবং মুদ্রাব্যবস্থার রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা যদি বিষয়গুলো জানতো, আগামীকাল রাত পোহাবার আগেই গণবিপ্লব শুরু হয়ে যেত।'*

হেনরি ফোর্ড— ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা।

হেনরি ফোর্ডের এই বক্তব্যের মর্ম জানার জন্য তখন থেকেই আমার মন খচখচ করতে থাকে। সেই সময় এ-সম্পর্কে গভীরভাবে কিছু উপলব্ধি না করলেও এতটুকু নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম যে, ব্যাংকিং ও মুদ্রাব্যবস্থার রহস্যময় কিছু বিষয় অর্থনীতির ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমার অধরাই রয়ে গেছে। উচ্চতর অধ্যয়নের পরবর্তী ধাপগুলোতে নিয়তই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি এই দেখে যে, মুদ্রাব্যবস্থার নিগূঢ় বিষয়গুলো কোনো প্রতিষ্ঠানেই পড়ানো হচ্ছে না। 'নরওয়ে স্কুল অব ইকনমিক্স'-এ মুদ্রাবিষয়ে একটি মাত্র কোর্স ছিল, যার বিষয়বস্তু ততদিনে আমার ভালোভাবেই দখলে এসে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে, যখন জার্মানির স্বনামধন্য 'মানহাইম বিজনেস স্কুলে' দ্বিতীয় মাস্টার্সের উদ্দেশ্যে যাই, সেখানেও এই বিষয়ে কোন কোর্স পাইনি। অথচ এই দুটি প্রতিষ্ঠানই ছিল সেই দুই দেশের সেরা বিজনেস স্কুল।

মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতি বোঝার অবিচ্ছেদ্য পাঠ এগুলো। কিন্তু তারপরেও কেন জানি মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার গুপ্ত দিকগুলো সবসময় এড়িয়ে যাওয়া হতো। এমনকি বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা অর্থনীতিবিদ Richard Werner ও এমন মন্তব্য করেছেন। এই বিষয়ে তিনি আরো যোগ করেন যে :

> *'Economics that is taught at university is not the real economics. It is a whole second economics of how things really work.'*

–Richard Werner, Central Bank watcher and investment strategist, Author and researcher.

'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিখানো অর্থনীতি বাস্তবভিত্তিক না। বিশ্বব্যবস্থা কীভাবে চলছে তা বুঝতে সম্পূর্ণ নতুন ধারার অর্থনীতির পাঠ প্রয়োজন।'

—*রিচার্ড ভার্নার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক গবেষক, লেখক এবং বিনিয়োগ কুশলী।*

এই নতুন ধারাটা কী? তা জানার আগ্রহই আমার জ্ঞান অর্জনের যাত্রার চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। তাই আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার গণ্ডি ভেদ করে আমি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকি। এভাবে দীর্ঘ অধ্যবসায় ও ক্রমাগত সাধনার ফলে এক সময়ের ভাসা ভাসা ধারণাগুলো ক্রমশই স্বচ্ছতর হতে থাকে।

বর্তমানে এই জ্ঞানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিনসহ বিভিন্ন অনলাইন প্লাটফর্মে লেখালেখি করছি। মূলত, পাঠকদের উচ্ছ্বসিত সাড়াপ্রাপ্তির পর বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করে সরল ভাষায় একটি বই লেখার উদ্যোগ নেই।

এই বইটি রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম কঠিন একটি কাজ ছিল ভাষার সরলতা বজায় রাখাটা।

একই সাথে মৌলিকতা ধরে রাখা এবং গল্পের ছলে বর্ণনা করা খুব একটা সহজ কাজ না। কিন্তু সবার কাছে বাণী পৌঁছে দিতে সেই কঠিন সিদ্ধান্তে শেষপর্যন্ত অটল থেকেছি এবং অর্থনীতি বিষয়ে অজ্ঞ পাঠকদেরকে দিয়ে পড়িয়ে, বোধগম্যতা নিশ্চিত করেই পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেই।

সবশেষে যেই দুইজন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেই নয়, তারা হচ্ছেন মিনহাজ রেজা ভাই এবং মাহমুদ রহমান। বইটির ভাষাগত মাধুর্যতার পিছনে তাদের স্নেহমাখা হাতের স্পর্শ পরতে পরতে লেগে আছে। আল্লাহ তাদের পরিশ্রম ও ত্যাগ কবুল করুক।

আশা করি, শত শ্রমের বিনিময়ে রচিত বইটি আলো প্রদানকারী একটি কর্ম হিসেবে যুগ যুগ আমাদের মাঝে টিকে থাকবে। আমিন।

ধন্যবাদান্তে

মোহাইমিন পাটোয়ারী

অর্থনৈতিক বিশ্লেষক এবং লেখক

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি। দরুদ ও সালাম শেষ নবি রসুলুল্লাহ সা.-এর প্রতি।

আপনি হয়তো থ্রিলার পড়তে পছন্দ করেন; আর বাস্তবমুখী থ্রিলার? 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বাস্তব দুনিয়ার লুকায়িত সত্যকে উন্মোচনকারী অবিশ্বাস্য এক থ্রিলার। এর শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভ্রমণ ব্যতিত আপনার চোখ ও শরীর বিশ্রাম নিতে নারাজ। মুহুর্মুহ উত্তেজনাপূর্ণ যাত্রায় ঘোরা হয়ে যাবে অর্থনীতির অচেনা অলিগলি। গল্পে গল্পেই ভেদ হবে মায়াবি জালের রহস্যগুলো। উন্মোচিত হবে ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার জন্ম রহস্য, যৌবন কাহিনি এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তার আধুনিক হয়ে ওঠার গল্প।

অর্থনীতি জাতীয় বিষয়াদির জটিলতা প্রশ্নাতীত। তদুপরি, এক মলাটেই মূল্যস্ফীতি, ভার্চুয়াল কারেন্সি, দেউলিয়াত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা, বেইল আউট, জম্বি কোম্পানি, তারল্য সংকট প্রভৃতি যুক্ত হলে, পুরো বিষয়টাই জগাখিচুড়ি পাকিয়ে মাথার উপর দিয়ে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু, এখানেই লেখক মোহাইমিন পাটোয়ারীর কারিশমা। মৌলিক পরিভাষাগুলোকে তিনি অত্যন্ত সাবলীল উপস্থাপনায়, গল্পের ছলে সহজপাচ্য করে তুলে ধরেছেন। অর্থনীতির অ আ ক খ ধারণা ব্যতীতই, বইটি আপনার অন্তরের গহিনে তার বার্তাগুলো নিয়ে পৌঁছে যাবে, নিরন্তর কড়া নাড়তে থাকবে। আপনি ঝাঁপ দিবেন চমকপ্রদ একটা অ্যাডভেঞ্চারে, যার সাথে সিন্দাবাদের ভ্রমণ কিংবা অ্যালান কোয়াটারমেইনের গুপ্তধনের খোঁজে যাওয়ারই তুলনা চলে। সময়, সুযোগ ও সাহসের অভাবে যেই যাত্রাটা আপনি কখনোই শুরু করেননি, 'দি লর্ড অব দা রিংস'-এর 'গ্যানডাল্ফ' হয়ে মোহাইমিন পাটোয়ারী আপনাকে ছোঁ করে তুলে নিয়ে সেই সফরেই বেরিয়ে পড়বেন। আর 'হবিট'-দের মতো আপনি ছুটে চলবেন 'মিডল আর্থে'; ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য উদ্ধারে। ভ্রমণের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ সময়মতো যেয়ে আসবে আপনার হাতের নাগালেই! অর্থনীতি বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ হলেও যাত্রার অনিঃশেষ রস, সুবাস যেন ফুরোবার নয়।

আরেকটি আলোচ্য দিক হলো, 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' কোন ধর্মীয় বই না। এর লেখক মোহাইমিন পাটোয়ারীও কোন ধর্মীয় বক্তা নন। এই উজ্জীবিত তরুণ অর্থনীতি বিশ্লেষক, অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচনা করেছেন

এবং আলোচনার পরতে পরতে তিনি পশ্চিমা দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও নীতি-নির্ধারকদের এমন কিছু উক্তি সংগ্রহ করেছেন যা পাঠককে বিস্মিত করতে বাধ্য। যেমন আড়াইশ বছর আগের তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের উক্তিটি :

'আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশি সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপদজনক হচ্ছে ব্যাংকব্যবস্থা।'

অথবা ইংরেজ-জার্মান ব্যাংকার ও ফাইন্যান্সিয়ার নাথান মেয়ার রথসচাইল্ডের এই উক্তিটি :

'যেই সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায় না, তার সিংহাসনে কে বসল আমার তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ যে ব্রিটেনের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ক্ষমতার মালিক, আর ব্রিটেনের মুদ্রাব্যবস্থা আমারই নিয়ন্ত্রণে।'

সবশেষে, এই রোমাঞ্চকর যাত্রার অন্তে আছে রূপকথার গল্পের মতোই গুপ্তধন। আর তা হচ্ছে আপনার বহুদিনের সঞ্চিত সব প্রশ্নের উত্তর! টাকা আর ব্যাংকের মাঝে এত মধুর রসায়নটা কী? ধেই ধেই করে উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া বিশ্বে, হু হু করে সবাই দেউলিয়া হচ্ছে কেন? উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে আপনার আমার সকল সম্পদ কীভাবে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে! ইত্যাদি। আর হ্যাঁ, গল্পগুলোর ফাঁকে ফাঁকে রাখা যুৎসই সব চার্ট এবং রেফারেন্সগুলো আপনাকে গায়ে কাঁটা দেওয়া বাস্তবতার দিকে ঠেলে দিবে।

ব্যবসা, চাকরি, কিংবা কৃষি, যে যেভাবেই উপার্জন করি না কেন, আমরা সবাই আয়-উপার্যনের চিন্তায় বিভোর, এই ব্যাপারে আমরা যার পর নাই সচেতন। অপরদিকে, 'অর্থনীতি' হলো অবহেলার অন্যতম ক্ষেত্র, যেখানে আমরা কোনো আগ্রহই খুঁজে পাই না! অথচ, আপনি চাল কিনেন কিংবা চিনি, এর পিছনে আছে অর্থনীতি; যক্ষের ধনের মতো টাকা সঞ্চয় করে রাখেন কিংবা ব্যয় করে ফেলেন, এর পিছনেও আছে অর্থনীতি; সোনা-রূপায় লেনদেন করেন কিংবা কাগজ-কার্ডে, এর পিছনেও রয়েছে অর্থনীতি। তারপরেও এই বিষয়ে অজ্ঞতা কাটানোর ন্যূনতম প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে না। সেই অজানা জগতের বাস্তবিকতাগুলোই গল্পের মণিমুক্তায় ভরিয়ে অপরূপ করে তুলেছে 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বইটি।[১] আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বইটি পাঠকদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মিনহাজ রেজা
উদ্যোক্তা, অর্থনীতিবিদ ও সম্পাদক

---

১ "ওহে মানবজাতি! ভূমন্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে বৈধ উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বস্তুতঃ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"
- আল কুরআন, সূরা বাক্বারা, আয়াত ১৬৮

সূচিপত্র

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়
আসুন একটু ভাবি...

আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন কি, সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কী? টাকা উৎপন্ন হয় কীভাবে? কাগুজে টাকার মাঝে মূল্যমান প্রবেশ করে কেন? অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে কেন? এই প্রশ্নগুলো হয়তো আমার মতো আপনাকেও তাড়া করে বেড়িয়েছে এবং এগুলোর উত্তর হয়তো বা আংশিক পেয়েছেন কিংবা কোনো উত্তরই খুঁজে পাননি। আপনি উপরের যে দলভুক্তই হয়ে থাকুন না কেন, কোনো চিন্তা করবেন না, কারণ এই বইয়ে আমরা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত জানবো। আর আমাদের এই জানার যাত্রা খুব সাধারণ একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি, 'সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কী?'

প্রথমত, এই প্রশ্নটি সাদা চোখে খুব সরল কিংবা অযৌক্তিক মনে হতে পারে। অথবা মনে হতে পারে, এমন প্রশ্ন করারই বা কী প্রয়োজন ছিল? তবে প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটি মোটেও সরল কিংবা অযৌক্তিক নয়। চিন্তা করে দেখুন— সুদের সাথে ব্যবসার তুলনা করতে গিয়ে প্রথমে যেই পয়েন্টটি উঠে আসে তা হচ্ছে 'সুদে কোন ঝুঁকি নেই'। কিন্তু এই কথাটি সম্পূর্ণ 'সঠিক' নয়। কারণ ঋণদাতা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও শতভাগ ঝুঁকিবিহীন পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে না। একজন গ্রাহক ঋণ নেবার পরে দেউলিয়া হতে পারে, অর্থ আত্মসাৎ করে পালিয়ে যেতে পারে কিংবা সম্পদশূন্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। এগুলো সবই মহাজনের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ। তাই, 'সুদে কোন ঝুঁকি নেই' কথাটি সম্পূর্ণ সত্য না। সুদে ধার দিলে ঋণদাতারও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সুযোগ আছে।

সুদের ব্যাপারে দ্বিতীয় যেই পয়েন্টটি আমাদের সামনে আসে তা হচ্ছে, বস্তুগত পণ্যের (যেমন-ঘর বাড়ির) ক্ষয় (depreciation) আছে। একটি বাড়ি ধীরে ধীরে পুরানো হয়, ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমনকি একসময় ভেঙে পড়ে যায়।

তেমনি করে একটি গাড়ি কিংবা একটি কারখানাও একসময় অচল হয়ে যায়।
সেই তুলনায় টাকার কোন ক্ষয় নেই।

কিন্তু খেয়াল করুন, সম্পদের যেমন ক্ষয় আছে, তেমনি টাকারও মূল্যমানের ক্ষয় আছে। এই বছর যেই বস্তুটির মূল্য ১০০ টাকা, ১০ বছর পরে তার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে যাবে ২০০ টাকা। এমনকি একসময় হয়তো ১০০ টাকার নোটও অচল হয়ে যাবে। এমনটি হবার কারণ কী? কারণ হচ্ছে, টাকার মূল্যমানের ক্ষয়।

অর্থাৎ, ব্যবসায় ক্ষয় আছে কিন্তু সুদে কোন ক্ষয় নেই, এই কথাটিও ভুল।

সুদ নিয়ে অপর যেই অভিযোগটি উঠে, তা হলো একজন সুদি মহাজন গ্রাহকের থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায় করে থাকে। গ্রাহক লাভ করেছে নাকি লোকসান করেছে, তা তিনি বিবেচনা করেন না। সকল পরিস্থিতিতেই কেবল নিজের লাভ বুঝেন।

এই কথাগুলো সত্য, তবে একই বাস্তবতা ব্যবসার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। একজন বিপণি বিতানের মালিকও তার দোকান ভাড়া নেওয়া ব্যবসায়ীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করেন না। ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লাভ হোক কি লোকসান, মাস শেষে তিনি এক প্রকার জোরপূর্বক ভাড়া আদায় করে থাকেন। তাই একমাত্র সুদি মহাজন টাকা আদায়ের ব্যাপারে কঠোর, কিন্তু ব্যবসায়ী নয়, এই কথাটিও সঠিক নয়।

সুদের সাথে ব্যবসার পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে চতুর্থ যেই বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে, ব্যবসার পরিচর্যা ব্যয় আছে। যেমন— একটি বাড়ি মেরামত করা, রং করা কিংবা অন্য কোন সমস্যা হলে ঠিকঠাক করাই হলো বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়। অন্যান্য সম্পদের বেলায়ও অনুরূপ দেখাশোনা করতে হয়। যেমন একটি গাড়ি কিনে ভাড়া দিলে গাড়ির মেরামত করতে হয়, একটি বাগান ভাড়া দিলে বাগানের দেখাশুনা করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু টাকার বেলায় এরূপ কোন পরিচর্যা খরচ নেই।

এই দাবিটিও 'পুরোপুরি' সঠিক নয়। টাকার সরাসরি পরিচর্যা খরচ না থাকলেও এর নিরাপত্তা প্রদান, কর্মচারিদের বেতন, অফিস ভাড়া, কারেন্ট বিল ইত্যাদি বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। আবার একজন গ্রাহক দেউলিয়া হয়ে গেলে, সেই ক্ষতির ভারটাও মহাজন বা ব্যাংককেই বহন করতে হয়। এই সব কিছুই সুদভিত্তিক ঋণের পরিচর্যা খরচ।

তাই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আছে কিন্তু ঋণের বেলায় কোন ব্যয় নেই, তা যুক্তির ধোপে টিকবে না।

সুদের ব্যাপারে আরেকটি আলোচনা রয়েছে যে, সুদে আয় নির্দিষ্ট কিন্তু ব্যবসার আয় অনির্দিষ্ট।

চিন্তা করে দেখুন, আপনি একটি বাড়ি কিংবা দোকান তৈরি করে ভাড়া দিলে, চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া পেয়ে থাকেন। সুদের মত বাড়ি ভাড়ার রিটার্নেও কোন তারতম্য হয় না। আবার একটি গাড়ি কিনে রেন্ট-এ-কার কোম্পানিকে ভাড়া দিলেও, আপনি প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া পেয়ে থাকেন।

শুধু তাই নয়, সরকারি বা বেসরকারি, যেকোন প্রজেক্টে বিনিয়োগের পূর্বে সম্ভাব্য খরচ ও লাভের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক প্রাক্কলন দাঁড় করানো হয়। বিনিয়োগে সুদ থাকুক বা নাই থাকুক, প্রাক্কলনের সুবাদে জানা যায়, বিনিয়োগ করলে সম্ভাব্য লাভ কত হতে পারে, আর ক্ষতি হলেও বা তার পরিমাণ কত হতে পারে। প্রাক্কলনে যদি দেখা যায়, সব খরচ করার পরেও লাভ থাকে, তখনই কেবল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। অর্থাৎ, শুধু সুদের ক্ষেত্রেই নয়, অংশীদারিত্ব ব্যবসা পদ্ধতিতেও রিটার্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেই বিনিয়োগ করা হয়।

আপনি ভাবতে পারেন, তারপরেও তো কিছু পার্থক্য রয়ে যায়। সুদের রিটার্ন নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু ব্যবসার রিটার্নের বেলায় তা অসম্ভব। এ ধারণাটির সাথেও বাস্তবতার ফারাক থেকে যায়। সুদের রিটার্নও নিখুঁতভাবে নিরূপণ করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে দেউলিয়া হওয়ার হারে তারতম্য ঘটে এবং ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে, তা আগের থেকে বলা অসম্ভবই বটে। পাশাপাশি সুদে মনিটরিং, আইনি ব্যয়, কর্মচারি বেতন-বোনাস সহ নানা প্রকার আনুষঙ্গিক খরচ রয়েছে, যার কোনটাই আগে থেকে শতভাগ নির্ণয়যোগ্য না। তাই মোটা দাগে, সুদে ঋণ দিলে আগে থেকেই রিটার্ন জানা যায় কিন্তু ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে জানা যায় না, এই কথাটা সত্য না।

সবশেষে যে অভিযোগটি আসে তা হচ্ছে সুদ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করুন, যেকোন সফল ব্যবসা করেই কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্পদশালী হওয়া সম্ভব। ব্যবসায়ীরা যেহেতু সমাজের অপরাপর সদস্যের সাথে লেনদেন থেকে অর্জিত অর্থেই ধনী হয়ে থাকেন, সেহেতু যেকোন সফল ব্যবসা করলেই ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে।

তাহলে যেই প্রশ্নটি আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হলো, অর্থনৈতিকভাবে সুদের সাথে ব্যবসার তফাৎটা কোথায়? দুজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে সুদের লেনদেন করলে, তারা সমাজের কোনো ক্ষতি

করল কি? ধনী হবার কারণে একজন সাধারণ ব্যবসায়ী যদি অপরাধী না হয়ে থাকেন, ঋণ-ব্যবসায়ী কেন সমাজ ও ধর্মের দৃষ্টিতে অপরাধী বলে বিবেচ্য হবেন? সেই কোটি টাকার উত্তরের গভীরেই আমরা ডুব দেব। তবে তার আগে পাঠক পর্যায়ে অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন, যা এই আলোচনাকে বুঝতে সাহায্য করবে।

অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো গঠন

অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলো বোঝার একটি কার্যকরী পদ্ধতি হলো প্রথমে অতি সরল পরিসরে চিন্তা শুরু করা এবং পরবর্তীকালে ধাপে ধাপে নতুন মাত্রা যুক্ত করা।

ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে ধারণাটি পরিষ্কার হবে। ধরুন, আজকে বাজারে গরুর মাংসের দর কেজিতে ৮০০ টাকা। এই ৮০০ টাকা দরে আপনার শহরে প্রতিদিন তিনশ কেজি গরুর মাংস বিক্রি হয়। হঠাৎ দরপতনে মাংসের দাম কেজি প্রতি মোটে ৫০০ টাকায় নেমে গেল। তখন কী হবে? ঠিক ধরেছেন, সবাই মাংস কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। অর্থাৎ, ৮০০ টাকা দরে বাজারে যতো মাংস বিক্রি হতো, দাম কমে ৫০০ হলে তার তুলনায় বিক্রি অনেক বেড়ে যাবে। এবার যদি বলি, গরুর মাংসের দাম বেড়ে কেজিতে ১৫০০ টাকা হয়ে গেছে? তখন কী হবে? জি, মাংসের বাজারে ক্রেতা তো দূরে থাক, মাছিও উড়বে না। অর্থাৎ, ৮০০ টাকা দরে যতো কেজি মাংস বিক্রি হতো, দাম বেড়ে ১৫০০ টাকা হলে, মোট বিক্রি তার তুলনায় কমে যাবে।

এভাবে খুব সহজেই আমরা বলতে পারলাম যে,

'দাম কমলে, বিক্রি বেড়ে যাবে। আবার দাম বাড়লে, বিক্রি কমে যাবে।'

খেয়াল করুন, উপরে আমরা কেবল মাত্র ২টা নির্ধারক সামনে এনেছি, দাম ও বিক্রির পরিমাণ। এতেই দেখলাম দামের প্রভাবে বিক্রি বাড়ে ও কমে। আপনি-আমি সবাই উপরের উদাহরণের সাথে পরিচিত। কিন্তু এখানে আমরা আরো একটা কাজ করেছি। বলতে পারেন সেটা কী? আমরা পারিপার্শ্বিক সব কিছু 'অপরিবর্তিত' থাকবে ধরে নিয়েছি। সেগুলো কী কী?

ধরুন, আপনার এলাকায় গরুর মাংসের দাম যেদিন কমে গেল, তার আগের দিন কমিশনার সাহেব সবার বাসায় ২০ কেজি করে মাংস উপহার পাঠালেন। তখন কি এতো পরিমাণ মাংস বিক্রি হতো?

আর যদি, সেদিন কুরবানির ঈদের পরদিন হত? তাহলে কি আপনারা আগের মতো এতো বেশি মাংস কিনতেন? অবশ্যই না।

অর্থাৎ, আমরা দাম আর বিক্রির পরিমাণ নির্ধারণের বেলায় এরকম সম্ভাব্য ব্যাপারগুলো হিসেবের বাহিরে রেখে দিয়েছি। আমরা ধরে নিয়েছি এমন ব্যাপার ঘটবে না বা 'সংশ্লিষ্ট সবকিছু অপরিবর্তিত থাকবে'। অর্থনীতির ভাষায় একে বলে, 'সেটেরিস পারিবাস' (Ceteris Paribas)। তাই 'দাম বাড়লে বিক্রি কমে এবং দাম কমলে বিক্রি বাড়ে', বলতে আমরা আসলে বুঝি, *'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে, যদি দাম বাড়ে তাহলে বিক্রি কমে যাবে এবং যদি দাম কমে তাহলে বিক্রি বেড়ে যাবে।'* অর্থনীতির এই চমকপ্রদ চিন্তার কাঠামোটা আমাদেরকে অভিভূত করে।

এখন এই কাঠামোটার একটি প্রায়োগিক পরিপ্রেক্ষিত দেই— ধরুন, উপরের উদাহরণ অনুসারে আমরা জানতে চাই, তেলের দাম বেড়ে গেলে গরুর মাংস খাওয়া বাড়বে নাকি কমবে? আচ্ছা, তেলের দামের সাথে গরুর মাংস খাওয়ার কী সম্পর্ক? ঠিক ধরেছেন, তেল দিয়েইতো মাংস রান্না করা হয়। সুতরাং, তেলের দাম বাড়লে গরুর মাংস রান্নার মোট খরচ বেড়ে যাবে। তাই আগের মতো মাংস খেতে হলে, আপনাকে বাড়তি পয়সা গুনতে হবে। 'আপনার মাসিক বাজেট আগের মতই থাকলে', আপনি গরুর মাংস কম রান্না করবেন অথবা, অন্যান্য খাবার কম খেয়ে মাংস রান্না করবেন, অথবা বাসার আনুষাঙ্গিক ব্যয় কমাবেন... এরকম একশ-একটা পথ আছে, তাইতো?

এবার আমরা চিন্তার কাঠামোটা নিয়ে আসি। দেখুন কত সুন্দর কাজে লাগে।

প্রশ্ন : 'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে, যদি তেলের দাম বাড়ে তাহলে গরুর মাংসের বিক্রির কী হবে?'

উত্তর : যখনই বলছি, 'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে', এর মানে হলো, গরুর মাংসের সরবরাহ, আয়-রোজকার, মসলা খাওয়ার পরিমাণ, রান্নায় তেলের পরিমাণ, বাসার অন্যান্য খরচ এগুলো সব আগের জায়গায় থাকবে। কিছুই পরিবর্তিত হবে না। সব অপরিবর্তনশীল রেখে শুধু তেলের দাম বাড়িয়ে দেখবো এতে করে গরুর মাংসের বিক্রিতে কী ধরনের পরিবর্তন হয়।

দেখা যাবে, তেলের দাম বাড়লে, তেলের বিক্রিও কমে যাবে। আপনি গরুর মাংস রান্না করতে আগের মতই তেল ব্যবহার করলে এবং মাসিক বাজেট আগের মতই থাকলে কি আগের সমপরিমাণ মাংস রান্না করতে পারবেন? না, তা সম্ভব না। তার মানে, আপনি মাংস রান্না করা কমিয়ে দিবেন। সুতরাং, কাঠামোর মধ্যে রেখে আমরা উত্তর পেলাম যে, 'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থেকে তেলের দাম বেড়ে গেলে, গরুর মাংসের বিক্রি কমে যাবে'

আশা করি, আপনারা কাঠামোটি খুব সহজেই ধরতে পেরেছেন।

এভাবে, অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়কে উহ্য রেখে একটি সরল কাঠামোর মধ্যে ফেলে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় (সেটিরাস পেরিবাস)। সব চিন্তাই শুরু হয় সরল পরিসরে, একটা-দুইটা মাত্রা দিয়ে। আলোচনা যতো সামনের দিকে আগায়, নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে পরিসর বাড়াই এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করি। আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে সুদের প্রভাব কী? ব্যবসার সাথে এর পার্থক্য কী? তা বুঝতে প্রথমেই আমরা তাই রূপসাগর নামে একটা অর্থনৈতিক কাঠামোর অবয়ব তৈরি করব।

রূপসাগর

দ্বীপরাষ্ট্র রূপসাগর আয়তনে বিশাল এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তবে সব দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার জনসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। আপাতত দেশটিতে মোট দশটি পরিবার বসবাস করে। এদের কেউ মাছ ধরে, কেউ পশুপালন করে, কেউ তাঁত বুনে, কেউ কাঠের কাজ করে, কেউবা ব্যবসা করে এবং সারাদিন কাজ করে তারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার থেকে কেনাকাটা করে ঘরে ফিরে। সবকিছু ঠিকঠাক চললেও এই দেশের একটি সমস্যা হচ্ছে এখানে লেনদেন করার কোন সাধারণ বস্তু অর্থাৎ, 'টাকা' নেই। কেউ মাছের বিনিময়ে চাল, কেউ ধানের বিনিময়ে ডাল, কেউ শ্রমের বিনিময়ে খাদ্য এভাবে লেনদেন করে কাজ চালিয়ে নেয়। তবে বিনিময়ের জন্য উপযুক্ত পক্ষ খুঁজে না পেলে, বিপত্তি লেগে যায়। কোন একদিন হয়তো জেলের জালে বেশি মাছ ধরা পড়ে। সেদিনও তার ঘরে চাল লাগে। কিন্তু বাজারে গিয়ে জেলে মশাই যদি আবিষ্কার করেন, চাল বিক্রেতার সেদিন আর মাছের প্রয়োজন নেই, বরং সে হন্যে হয়ে কাপড় খুঁজছে। তখন কী উপায়?

সেক্ষেত্রে উপায় হচ্ছে মাছের প্রয়োজন রয়েছে, এমন একজন তাঁতিকে প্রথমত খুঁজে বের করা। তারপর সেই তাঁতির থেকে মাছের বিনিময়ে কাপড় কিনে নেওয়া এবং সবশেষে সেই কাপড়ের বিনিময়ে কৃষকের থেকে চাল কিনে নেওয়া।

প্রক্রিয়াটি একটু জটিল হলেও সমাধানযোগ্য। কিন্তু এমন যদি হয় যে, কোন তাঁতিই মাছ কিনতে আগ্রহী না? সেক্ষেত্রে সত্যিই খুব বিপত্তি বাঁধবে, কারণ মাছ দীর্ঘসময় সংরক্ষণ করে রাখা যায় না।

বিনিময় প্রথায় লেনদেনের অনিশ্চয়তার সমাধানে দ্বীপের সবাই মিলে পরামর্শে বসল, 'কী করা যায়?' একজন বুদ্ধি দিলো, রূপনগরের অধিবাসীরা এক রকম সোনালি ধাতু দিয়ে গহনা বানায়, যা ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই খুব পছন্দ করে। কেউ এই সোনালি ধাতুর একটি গুটির বিনিময়ে এক মণ চাল কিনতে চাইলে, সব চাল বিক্রেতাই রাজি হয়ে যাবে। একইভাবে এমন একটি গুটির বিনিময়ে মাছ কিনতে গেলে, জেলেরাও মাছ বিক্রিতে রাজি হবে। এক কথায়, এই সোনালি ধাতুটি সর্বজন গ্রাহ্য এবং সাধারণ বস্তু। তাই লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে এটিকে চালু করলেই, বাজার করতে আর কারো ঝক্কি পোহাতে হবে না। তাই সবার সম্মতিক্রমে রূপনগরের সোনালি জিনিসটাকে (স্বর্ণমুদ্রাকে) বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চালু করা হলো। এভাবেই, রূপনগরের অর্থনীতি পণ্য বিনিময় প্রথার (Barter system) যুগ পেরিয়ে মুদ্রাব্যবস্থার যুগে প্রবেশ করল। আর্থিক লেনদেনের সমস্যা সমাধানের এরকম প্রচেষ্টা থেকেই কালের আবর্তে মানুষ মুদ্রায় লেনদেন আরম্ভ করে।

এদিকে মুদ্রাপ্রথা চালু করতে গিয়ে নতুন সমস্যা বাঁধলো। সবার কাছে তো স্বর্ণ নেই! একজন বুদ্ধি দিলো, "এখনো তো 'কেনা-বেচা' শুরু হয়নি, সব স্বর্ণ জড়ো করে সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেই?"

সবাই ভেবেচিন্তে দেখলো, তাদের দাস-দাসিরা, ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা, সন্তান-সন্ততি, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সব আগের মতই থাকবে। কেবল সামান্য কিছু শখের বস্তু নিজেদের মাঝে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এই কষ্টকর সিদ্ধান্তের বিনিময়ে এরপর থেকে সবার জন্য কেনাকাটা আরামদায়ক হবে, মেনে নিতে ক্ষতি কী? একবারের জন্যই তো। এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বার বার নিতে হচ্ছে না। তাই সাময়িক ক্লেশ সত্ত্বেও সবাই সিদ্ধান্তটি মেনে নিল এবং সেই পরিকল্পনা মোতাবেক সবার স্বর্ণ জড়ো করে মোট ১,০০০টি

সোনার মুদ্রা তৈরি করা হল এবং মোট দশটি পরিবারের মাঝে সেগুলো ১০০টি করে বিতরণ করে দেওয়া হল।

সুদ ও ব্যবসার পার্থক্য

মুদ্রাব্যবস্থায় প্রবেশ করার পর রূপসাগরে লেনদেন প্রক্রিয়া অতি সাবলীল হয়ে গেল। প্রতিটি পরিবার এখন প্রয়োজনমত কেনা-বেচা করে নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরছে। সবেমাত্র পণ্য লেনদেন প্রথা থেকে উঠে আসা পরিবারগুলো যেই পরিমাণ জিনিস কিনছে, গড়পড়তা তার সমপরিমাণ জিনিসই বিক্রি করছে। ফলে, প্রত্যেকের কাছে কেনা-বেচা শেষে গড়পড়তা ১০০টি মুদ্রাই অবশিষ্ট থাকছে। তবে মানুষের জীবনে উত্থান-পতন থাকে, সব দিন একরকম যায় না। সে নিয়মের চক্রে রূপসাগরের এক তরুণ ব্যবসায়ী 'জীবন'-এর জীবনে আপদ দেখা দিল। সেবারের মতো বিপাক কাটিয়ে উঠতে, তার চারটি স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন পড়লো। জীবন তার তরীর কাছে গিয়ে বলল, 'এক মাসের জন্য ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ধার দেওয়া যাবে?'

জীবনের সমস্যা সমাধানে তরী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

এক্ষেত্রে মোট তিন প্রকার লেনদেন ঘটতে পারে।

কেস ০১ — সুদমুক্ত ঋণ

তরী জীবনকে বিনা সুদে ঋণ দিতে পারে। অর্থাৎ, ঋণ দেবার পরে তরী বলবে, 'যেই ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিয়ে, শুধু সেই ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দিলেই চলবে।'

এভাবে ঋণ নিলে এবং মাস শেষে ঋণ ফেরত দিলে, জীবন ও তরীর মাঝে মোট মুদ্রায় কোন পরিবর্তন আসবে কি?

না, আসবে না। দুজনের কাছেই মাস-শেষে সমান সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট থাকবে।

একই শর্তে প্রতি মাসে একবার করে ১ বছরে মোট ১২ বার জীবন, তরীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করে দিলেও, বছর শেষে তাদের মালিকানাধীন মোট মুদ্রার সংখ্যার কোন পরিবর্তন আসবে না, সমপরিমাণই থাকবে।

আচ্ছা, ব্যবসায়ী জীবন ও ঋণদাতা তরী একত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করলে কী হতো?

কেস ০২—অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা

এবারে ঋণ নেয়ার কথা তুলতেই তরী জীবনকে বলল, 'ঋণ তো ব্যবসার জন্যই প্রয়োজন। চলো, আমরা একসাথে ব্যবসা করি। তুমিও লাভ নাও, আমিও লাভ নেই। আবার লোকসান হলে দুইজনেরই হোক।'

তরীর প্রস্তাবটিতে জীবন রাজি হয়ে গেল।

রফা হল, জীবন ও তরী যথাক্রমে ৪টি করে স্বর্ণমুদ্রা বিনিয়োগ করবে। এই ৮টি স্বর্ণমুদ্রা তারা একটি প্রকল্পে খাটাবে এবং বছর শেষে প্রকল্পটি গুটিয়ে ফেলা হবে। লাভের অর্ধেক নিবে তরী, অর্ধেক নিবে জীবন। লোকসান হলে তার ভারও দুজনে সমানে সমানে বহন করবে।

ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি উভয়টা হওয়াই স্বাভাবিক। ধরা যাক, সবকিছু ঠিক থাকলে ৫০% সময় লাভ হবে এবং ৫০% সময় ক্ষতি হবে; তাহলে, ১২ মাসের মধ্যে লাভ হবে ৬ মাস এবং ক্ষতি হবে ৬ মাস।

ব্যবসায় লাভের মাসে জীবনের হাতে আসে ২টি স্বর্ণমুদ্রা, আর ক্ষতির মাসে তার হাত ছাড়া হয়ে যায় ২টি স্বর্ণমুদ্রা।

৫০% সময় ক্ষতি হওয়ায় ৬ মাসে মোট ক্ষতি হবে ১২টি স্বর্ণমুদ্রা
৫০% সময় লাভ হওয়ায় ৬ মাসে মোট লাভ হবে ১২টি স্বর্ণমুদ্রা

বছর শেষে প্রকল্প গুটিয়ে নিলে তরী ফেরত পাবে ৪টি স্বর্ণমুদ্রা এবং জীবন পাবে ৪টি স্বর্ণমুদ্রা। বছর শেষে দুইজনের কাছেই ১০০টি স্বর্ণমুদ্রা রয়ে যাবে।

কেস ০৩—সুদে ঋণ

এই কেসে ধরে নেই, জীবন ঋণ নেয়ার কথা তুলতেই তরী শর্ত জুড়ে দিল, '৪টি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিলে, ফেরত দিতে হবে ৬টি স্বর্ণমুদ্রা।' বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে জীবন এই শর্তে রাজি হয়ে গেল এবং মাস শেষে সুদসমেত ঋণ পরিশোধ করল। জীবন ও তরীর মোট মুদ্রার কি কোন পরিবর্তন এসেছে?

হ্যাঁ, এবার এসেছে। জীবনের কাছে মাস-শেষে ৯৮টি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে এবং তরীর কাছে আছে ১০২টি স্বর্ণমুদ্রা।

এভাবে একই শর্তে ১২ বার (পুরো বছর) জীবন ঋণ নিলে ও সময়মত ঋণ পরিশোধ করলে, বছর শেষে তাদের মোট সম্পদের কি কোন পরিবর্তন আসবে?

হ্যাঁ, বছর শেষে জীবনের কাছে থাকবে ৭৬টি স্বর্ণমুদ্রা এবং তরীর কাছে থাকবে ১২৪টি স্বর্ণমুদ্রা।

এভাবে রূপসাগরে প্রথমবারের মতো ছোট্ট পরিসরে ও সরলরূপে নিশ্চিত অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূচনা হলো।

খেয়াল করুন, উপরের কাঠামোতে ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি, চুরি-ডাকাতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, অসুখ-বিসুখ মৃত্যু-মহামারিসহ বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারতো। কিন্তু এখানে তার কিছুই ঘটেনি। কারণ, আমরা ধরেই নিয়েছি যে, এমন কিছু ঘটবে না। তার মানে,

'অন্য কোন উপাদানের প্রভাব ছাড়াই শুধুমাত্র সুদের কারণে একটি সমাজে সুনিশ্চিত বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে।'

নিশ্চয়ই ব্যবসায় সফলতা ধরে রাখতে পারলে (৫০% এর অধিক সময় লাভ করলে), একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে অপরাপর সদস্যদের তুলনায় সম্পদশালী হওয়া সম্ভব। আবার ব্যবসা বিফল হলে তার পক্ষে সব খোয়ানোও সম্ভব। এভাবেও অর্থনৈতিক পার্থক্য হতে পারে। তাছাড়া অসুখ-বিসুখ, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা কারণে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য তৈরি হতে পারে। তবে আমরা এদেরকে বৈষম্য বলতে পারি কি? লক্ষ্য করুন, এই নিয়ামকগুলো অনিশ্চিত এবং সমাজের যেকোন পক্ষে সংঘটিত হতে পারে। সেই তুলনায় সুদে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া নিশ্চিত এবং তা নিতান্তই একপেশে।

এভাবে আমাদের বুনিয়াদি চিন্তাকাঠামো 'রূপসাগর' জনপদটি থেকে 'সুদ' এর সুনিশ্চিত বৈষম্যের আঙ্গিকটা সুস্পষ্ট হলো। আপনি সমগ্র পৃথিবীকে একটি দ্বীপ এবং এক একটি রাষ্ট্রকে এক একটি পরিবার হিসেবে কল্পনা করলে ঠিক এই ফলাফলেই পৌছাতেন। কেবল চিন্তার স্বচ্ছতা এবং ভাষার সরলতার স্বার্থেই রূপসাগরের উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রূপসাগরের শিশুরা বড় হয়ে নতুন নতুন পরিবার গড়েছে এবং পরবর্তীকালে তাদের সন্তানরাও নয়া পরিবার গঠন করেছে। এভাবে দেশটির জনসংখ্যা আগের তুলনায় বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে। একই সময়ে পারস্পরিক লেনদেন, দুর্যোগ, কর্মস্পৃহা ও দুর্ভাগ্য ইত্যাদির প্রভাবে হাতে হাতে মুদ্রার সংখ্যায় বেশ অসমতাও দেখা দিয়েছে। কারো কম, কারো বেশি এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে এখন পর্যন্ত এই সমাজটি সম্পূর্ণ সুদমুক্ত আছে (জীবন ও তরী সুদে লেনদেন করেনি এবং তাদের পরেও কেউ তা করেনি)। এমন একটি বৈচিত্র্যময় সমাজে সুদের 'সুদীর্ঘ' প্রভাব কেমন হতে পারে?

মূল আলোচনা শুরু করার আগে, একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন কি? আমরা মোট তিনটি সরলীকৃত শর্ত তুলে নিয়েছি।

১. একদা সবার অর্থনৈতিক সক্ষমতা সমান থাকলেও, বর্তমানে তা অসমান। সমাজে কেউ ধনী এবং কেউ দরিদ্র।
২. ইতোপূর্বে দ্বীপের জনসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকলেও বর্তমানে তা অনির্দিষ্ট এবং সময়ের সাথে দ্রুতবর্ধনশীল (মোট জনসংখ্যা যেকোন গ্রহণযোগ্য সংখ্যা হতে পারে)।
৩. এককালে দ্বীপের অর্থনীতিতে কোনো প্রবৃদ্ধি ছিল না। বর্তমানে সময়ের সাথে অর্থনীতির আকার বড় হচ্ছে।

সবমিলিয়ে, রূপসাগরের সমাজ এবং অর্থনীতি পূর্বের তুলনায় বৃহদায়তনের, গতিশীল ও বৈচিত্র্যময়। এবার এমন একটি কাঠামোতে মুদ্রাব্যবস্থার উপর সুদের দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল আলোচনা করা যাক।

রূপসাগরের তরুণ প্রজন্মের একজন কাঠুরের নাম 'রিবা'। প্রতিদিন সকালে, সে বন থেকে কাঠ কেটে বিকালে সেই কাঠ বাজারে বিক্রি করে সংসার চালায়। আরেকজন কাঠুরে 'মজনু' রিবারই সতীর্থ। একদিন মজনু

ধার হিসেবে রিবার কাছে চারটি স্বর্ণমুদ্রা চাইল। সেই মোতাবেক, রিবা তাকে ১ মাসের জন্য মোট ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ধার দিল। তার পরদিন নদীর ধারে কাঠ কাটতে কাটতে রিবা চিন্তা করে দেখলো, এক মণ কাঠ বাজারে বিক্রি করলে সে পায় ২টি স্বর্ণমুদ্রা। এই ২টি মুদ্রাই তাকে তার পরিবারের জন্য ব্যয় করে ফেলতে হয়। মজনু ধারের ৪টি মুদ্রার পরিবর্তে তাকে ৬টি মুদ্রা ফেরত দিলে, বড় ভালো হতো! তখন আর এত কষ্ট করে কাঠ কাটা লাগত না।

রিবা জানতো এই বুদ্ধি কাজে দিবে, যেহেতু মজনুর জন্য এই ঋণ অপরিহার্য ছিল। তাই সে পরবর্তী মাসেই মজনুকে শর্ত দিল, ৪টি মুদ্রা নিলে তার বিপরীতে তাকে ৬টি মুদ্রা ফেরত দিতে হবে, নাহলে সে আর ঋণ দিবে না। নিরুপায় মজনু সেই শর্তেই ঋণ নিয়ে নিল।

রিবা বুঝলো, এই ফন্দিটা আরো বড় পর্যায়ে অত্যন্ত কাজে দেবে, সম্পূর্ণ সমাজকেই মজনু বানানো যাবে। তাই সকল জমিজমা বিক্রিপূর্বক সে মোট ৫০টি মুদ্রা সংগ্রহ করে, ওগুলো সুদের ব্যবসায় লাগিয়ে দিল। ঋণের উপরে সুদের হার বছরে ২০ শতাংশ এবং সব সুদ সরল অংকের হলে, রিবা এক বছরে সুদ পাবে ১০টি স্বর্ণমুদ্রা এবং পাঁচ বছরে পাবে ৫০টি স্বর্ণমুদ্রা। সব মিলিয়ে ৫ বছর পরে রিবার হাতে সুদে-আসলে ফেরত আসছে মোট ১০০টি স্বর্ণমুদ্রা। চক্রবৃদ্ধি সুদে আরো বেশি মুদ্রা ফেরত আসতো। তবে রিবা সুদের ব্যবসায় নবীন ও অনভিজ্ঞ বলে শুধু সরল সুদেই সীমাবদ্ধ রইল।

এই পর্যন্ত লেনদেনগুলো বেজায় ন্যায্য এবং নিরীহ প্রকৃতির বলেই মনে হচ্ছে। রিবা তার কষ্টার্জিত মুদ্রা মানুষকে ধার দিচ্ছে বিধায় এর বিনিময়ে সে সামান্য বাড়তি কিছু চাইছে। তাছাড়া, বর্তমানে ত্যাগ করলে ভবিষ্যতে বেশি পাওয়া যায়, এমনটাই তো নিয়ম। রিবার ঋণ নগণ্য কিছু বৈষম্য সৃষ্টি করা ব্যতীত সামগ্রিক অর্থনীতির অপূরণীয় কোনো ক্ষতি করছে বলে বোধ হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে, সুদের মধ্য দিয়ে একজন ব্যক্তি তার কষ্টার্জিত টাকার উপযুক্ত বিনিময় মূল্য পাচ্ছে।

এই চিন্তাগুলোর সঠিকতা উপলব্ধি করতে, একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। এই যে নতুন ৫০টি মুদ্রা ঋণের কল্যাণে রিবার হাতে এসেছে, তা কোথা থেকে এসেছে? দ্বীপে নতুন কোনো সোনার খনি আবিষ্কার না হয়ে থাকলে, সেগুলো নিশ্চয়ই অপর কোন অধিবাসীর পকেট থেকে বের হয়ে এসেছে। যারা এই বাড়তি মুদ্রা জোগাড় করে দিয়েছে, তারা হয় বাড়তি আয় করেছে অথবা ব্যয় সংকোচন করেছে অথবা নিজেদের সম্পত্তি বিক্রি করেছে। যেভাবেই ঋণীরা সুদাসল জোগাড় করে আনুক না কেন, একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন, পাঁচ বছরে রিবার হাতে মুদ্রার সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে গেছে।

এখন রিবা চাইলে, মুদ্রাগুলো নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করে ফেলতে পারে বা সঞ্চয় করে রাখতে পারে কিংবা ঋণ হিসেবে দিয়েও দিতে পারে। রিবা যেহেতু এখন পূর্ণকালীন সুদের কারবারি, তাই হাতে আসামাত্রই সে ১০০টি মুদ্রা পুনরায় কোন এক উৎসুক ঋণগ্রহীতাকে গছিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে ঋণ দিতে সফল হলে ২০% সরল সুদে পরবর্তী ৫ বছরে সুদ আসবে ১০০টি মুদ্রা। অর্থাৎ, কোন গ্রাহক নিঃস্ব বা নিরুদ্দেশ না হলে, পরবর্তী পাঁচ বছরে ১০০টি মুদ্রা সুদ এবং ১০০টি মুদ্রা আসলসহ রিবার কাছে ফেরত আসবে মোট ২০০টি মুদ্রা। এভাবে প্রথম ১০ বছরে রিবার মালিকানার অন্তর্ভুক্ত হবে মোট ২০০টি মুদ্রা।

২০০টি মুদ্রা ফেরত আসার পরে রিবা সাহেব নিশ্চয়ই সেগুলো দিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলবে না। সুদের ব্যবসা ছেড়ে রিবার যেহেতু খেলোয়াড় হবার খায়েশ নেই, মুদ্রাগুলো হাতে আসার পর সে আবারও সম্ভাব্য সর্বোচ্চ দ্রুততায় সব ঋণ হিসেবে দিয়ে দিবে। এই ঋণ সুদে-আসলে পরবর্তী পাঁচ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে সাকুল্যে ৪০০টি মুদ্রায় দাঁড়াবে। এভাবে প্রথম পনেরো বছরেই ৫০টি মুদ্রা বৃদ্ধি পেয়ে হবে মোট ৪০০টি মুদ্রা। এই হচ্ছে রমরমা সুদের ব্যবসা।

আপনি হয়তো ভাবছেন অন্য কোনো ব্যবসা করেও সমপরিমাণ লাভ অর্জন করা সম্ভব ছিল। কিন্তু টাকার বিনিময়ে পণ্য বা সেবার ব্যবসা করা এবং টাকা দিয়ে টাকার ব্যবসা করা মোটেই এক বিষয় নয়। আপাতদৃষ্টিতে, এই পার্থক্য আপনার কাছে সামান্যই মনে হতে পারে অথবা মনে হতে পারে সুদ তো ব্যবসার মতোই। কিন্তু এই আলোচনা যতই সামনের দিকে আগাবে, ততোই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এই সামান্য পার্থক্যই সমাজ ও অর্থনীতিতে কত গভীর এবং শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে।

লক্ষ্য করুন, রূপসাগরের মোট মুদ্রার শতকরা ৪০ ভাগ এখন রিবার নিয়ন্ত্রণে, সেইসাথে বাকিসব মুদ্রাও অচিরেই তার মালিকানায় চলে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যেহেতু সমাজে মোট মুদ্রার সংখ্যা ১০০০টি, দ্বীপের বাদবাকি সবার মালিকানায় আছে মোট ৬০০টি মুদ্রা। আগের মতই ঋণ নবায়ন করতে থাকলে (ঋণ আদায়ের পর পুনরায় ঋণ দেয়াকে ঋণ নবায়ন করা বলে), পরবর্তী ৬ বছরে, অর্থাৎ, ঋণ ব্যবসা শুরু করার মাত্র ২১ বছরের মাথায় রিবার মালিকানায় থাকবে ৯৬০টি মুদ্রা। বাদবাকি সকলের মালিকানায় থাকবে কেবল ৪০টি মুদ্রা। তার মানে মাত্র ২১ বছরের মধ্যেই রূপসাগরের প্রায় সব মুদ্রা রিবার হাতে চলে আসছে।

এই ভয়ংকর ফলাফল আমাদের হতবাক করে দেয় ও প্রশ্ন তৈরি করে যে 'একটি জাতি কি এতো বেশি পরিমাণ ঋণ নিতে পারে?' ২০তম বছরে যখন

রিবার মালিকানায় ছিল ৮০০টি মুদ্রা, বাদবাকি সব অধিবাসীর মালিকানায় অবশিষ্ট ছিল ২০০টি মুদ্রা। এটা কী সম্ভব যে, মাত্র ২০০টি মুদ্রার অধিপতিরা ৮০০টি মুদ্রা ঋণ নিবে?

বিষয়টি সম্ভব বা অসম্ভবের আলোচনা এড়িয়ে এই দাবিটা সত্য বলে ধরে নেই যে, 'এত বেশি পরিমাণ ঋণ নেয়া একেবারেই অসম্ভব। অধিবাসীরা সর্বোচ্চ ১০০টি মুদ্রার সমপরিমাণ ঋণ নিবে। অর্থাৎ, রিবার ৫০টি মুদ্রা সুদে আসলে বৃদ্ধি পেয়ে মাত্র ১০০টি মুদ্রাতে পৌঁছালেই 'তালা-চাবি'। ঋণের পরিমাণ আর বৃদ্ধি করা যাবে না। পুরানো ঋণ নবায়ন করে করেই রিবাকে জীবন পার করে দিতে হবে।' জানলে হয়তো অবাক হবেন যে, তারপরেও ঠিক একই ফলাফল সংগঠিত হবে।

হিসাব করে দেখুন, ২০% সরল সুদে ১০০টি মুদ্রা ঋণ দিলে প্রতি বছর সুদ আসছে মোট ২০টি মুদ্রা। এখন এই নতুন ২০টি মুদ্রা যেহেতু ঋণ দেওয়া সম্ভব না, রিবা এগুলোকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে। এভাবে প্রতি বছর ২০টি মুদ্রা জমা করতে থাকলে মোট ৪৫ বছরে জনাব রিবার সঞ্চয়ে জমা পড়ছে ৯০০টি মুদ্রা। অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতেও সব কটি মুদ্রা ৪৫ বছরে রিবার হয়ে যাচ্ছে (৪৫×২০+১০০=১,০০০)। এমনকি রিবা যদি ১০০টি মুদ্রা ঋণ না দিয়ে প্রতি বছর কেবল শুরুর ৫০টি মুদ্রার ঋণ নবায়ন করতে থাকত, সেক্ষেত্রেও রিবা পরিবারই মোট ৯৫ বছরে দ্বীপের সব কটি মুদ্রার মালিক (৯৫ × ১০ + ৫০ = ১,০০০) হয়ে যেত!

দ্বিতীয় সম্ভাব্য অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে যে, 'সব মুদ্রা সঞ্চয় করে ফেলার বিষয়টা প্রকৃতপক্ষে সম্পূর্ণ অবাস্তব চিন্তা।'

একজন মানুষকে তার নিজের এবং নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ বাবদ অর্থকড়ি ব্যয় করতে হয়। সুদের কারবারিও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই রিবা ২০টি মুদ্রা সম্পূর্ণ সঞ্চয় না করে, এর থেকে কিছু অংশ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করবে সেটাই স্বাভাবিক।'

এই ধারণাটি যৌক্তিক। তাই আমরা ধরে নেই, রিবা প্রতি বছর ১০টি মুদ্রা নিজের জন্য ব্যয় করে বাদবাকি ১০টি মুদ্রা সঞ্চয় করে রাখে। খেয়াল করুন, এরপরেও সব মুদ্রা রিবা পরিবারের হাতে চলে যাবে। এমনকি যদি সে আরো কিছু বেশি মুদ্রা নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করত এবং আরো কম ঋণ নবায়ন করত, তাতেও সব মুদ্রা তার পরিবারের হাতেই কেন্দ্রীভূত হতো!

আরেকটু অগ্রসর চিন্তায় ভিন্ন একটি অভিযোগ সামনে আসতে পারে যে, একটি রাষ্ট্রের সব নাগরিক তো ঋণ গ্রহণ করে না। ঠিক তেমনি, রূপসাগর দ্বীপরাষ্ট্রের সকল নাগরিকও ঋণ গ্রহণ করবে না। সেক্ষেত্রে, সামান্য

কয়েকজন ঋণগ্রহীতাই কেবল তাদের মুদ্রা হারাবেন। রিবার ঋণ থেকে দূরে থাকা নাগরিকদের সুদি পদ্ধতির বিপুল বিস্তারেও হারানোর কিছুই নেই। অর্থাৎ, সুদের চক্রে সবার মুদ্রা একজন সুদ কারবারির হাতে কুক্ষিগত হবার সম্ভাবনা শূন্য! এই পর্যন্ত বর্ণিত ফলাফল কেবলই একটি তাত্ত্বিক সম্ভাবনা!!

প্রকৃতপক্ষে, একটি সমাজের সব সদস্যকে যে ঋণের আওতায় আসতে হবে, ব্যাপারটি এমন না। কেবলমাত্র একজন সফল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (যেমন-সরকার) যদি ঋণের বোঝা ক্রমাগত বহন করতে থাকে, তাতেও এই উদ্দেশ্য সফল হয়ে যাবে। কারণ, কত জন ঋণ নিচ্ছে বা কে নিচ্ছে, তা একদমই মুখ্য বিষয় নয়। যেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গই সুদ পরিশোধ করুক না কেন, ফলাফল অভিন্ন হবে।

ব্যবসা কাঠামো

সময়ের ব্যবধানে সুদ কীভাবে একটি অর্থনীতির সব মুদ্রা কুক্ষিগত করে ফেলে, তা আপনারা দেখছেন।

কিন্তু ব্যবসা করে কি সব মুদ্রা কুক্ষিগত করা সম্ভব? সম্ভব হলে, তা কীভাবে সম্ভব এবং সম্ভব না হলে, তা কেন অসম্ভব?

আসুন, এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে আমরা আবারো রূপসাগরে ডুব দেই।

প্রখ্যাত ব্যবসায়ী বুলবুল সাহেব ফন্দি আঁটলেন ব্যবসা করেই তিনি সব মুদ্রা হস্তগত করবেন। সেই পরিকল্পনা মাফিক বুলবুল সাহেব ৫০টি মুদ্রার পুঁজি কাজে লাগিয়ে সাগরের পাড়ে চমৎকার একটি বাড়ি নির্মাণ করলেন। নির্মাণকাজ শেষে বাড়িটি তার প্রতিবেশী ময়নার কাছে ভাড়া দিলেন। বাড়ির ভাড়া হচ্ছে বরাবর রিবার সুদের হারের সমান, বছরে ২০ শতাংশ বা ১০টি মুদ্রা। দেখা যাক, বুলবুল সাহেবের মহাপরিকল্পনা কতটা সফল হয়।

ভাড়া হাতে পাবার পর বুলবুল সাহেব যদি নিজ প্রয়োজনে সব মুদ্রা ব্যয় করে ফেলেন, মুদ্রার মালিকানা তার হাতছাড়া হয়ে যাবে। আবার তিনি যদি সেগুলো নতুন বিনিয়োগে খাটিয়ে ফেলেন, তাতেও ওগুলো হাতের বাইরে চলে যাবে। প্রথম কয়েক বছর এমন করে বুলবুল সাহেবের আক্কেল হলো। তাই তিনি এবার সব মুদ্রা জমানোর মাস্টারপ্ল্যান করলেন। এখন থেকে তিনি কোনো বিনিয়োগ করবেন না এবং সঞ্চয় ভেঙে ব্যয়ও করবেন না। বাড়ি ভাড়া থেকে অর্জিত সমস্ত মুদ্রা সিন্দুকে তালা মেরে রাখবেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন যক্ষের ধনের মতো মুদ্রা ধরে রেখে, বুলবুল সাহেব কি দ্বীপের সব মুদ্রা হস্তগত করতে পারবেন?

খেয়াল করুন, প্রতি বছর বাড়ি ভাড়া বাবদ ১০টি মুদ্রা জমা করলে বিশ বছর বাদে বুলবুল সাহেবের সংগ্রহে থাকবে সর্বোচ্চ ২০০টি মুদ্রা (২০×১০) কিন্তু সুদ কারবারির সংগ্রহে থাকবে ৮০০টি মুদ্রা। সুদ কারবারির তুলনায় ব্যবসায়ীর সংগ্রহ এতো কম কেন?

কম হবার কারণ হল সিন্দুকে বসে মুদ্রা ডিম পাড়ে না; বরং ধুলা ময়লা উপহার দেয়। অপরপক্ষে সুদে ঋণ দিলে মুদ্রাগুলো নতুন মুদ্রার জন্ম দেয়। গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল এই ব্যাপারটি অনুধাবন করেই মন্তব্য করেছেন :

> *'Money was intended to be used in exchange, but not to increase at interest. And this term interest, which means the birth of money from money, is applied to the breeding of money because the offspring resembles the parent. Wherefore of all modes of getting wealth this is the most unnatural.'*[২]
>
> *'মুদ্রার উদ্দেশ্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা, সুদে বেড়ে যাওয়া নয়। সুদ মানে টাকা নিজেই আরেকটা টাকার জন্ম দিচ্ছে এবং নতুন জন্ম নেয়া টাকাটা জন্মদাতা টাকার অবিকল প্রতিরূপ বটে। পৃথিবীতে সম্পদ বৃদ্ধির যাবতীয় উপায়ের মধ্যে এটিই সবচেয়ে উদ্ভট বা অপ্রাকৃতিক।'*
>
> — এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রিস্টপূর্ব)

আচ্ছা, বুলবুল সাহেব যদি মুদ্রাগুলো বিনিয়োগ করতেন, তাহলে কী হতো? তাহলে, মুদ্রাগুলো হাতছাড়া হয়ে যেত এবং মোট সম্পদ বৃদ্ধি পেতো। কিন্তু তিনি সে পথে হাঁটেননি। মুদ্রা ধরে রাখার আকাঙ্ক্ষায় তিনি পুনর্বিনিয়োগে নিতান্তই অনিচ্ছুক, আবার নৈতিক কারণে রিবার পথে হাঁটতেও তিনি নারাজ। তার মহাপরিকল্পনা হচ্ছে, সব মুদ্রা নিজ হাতে কুক্ষিগত করে দ্বীপের মুদ্রাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিবেন এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনে কিছুদিন কষ্ট করতে হলে, করবেন।

একজন চিন্তাশীল পাঠক অগ্রিম ভেবে বসতে পারেন, একদিন না একদিন তো সব মুদ্রা বুলবুল সাহেবের হাতে আসবেই। সুদ কারবারির মতো করে একটু ধৈর্য ধারণ করে কাজে লেগে থাকলে, বুলবুল সাহেবও সব মুদ্রা অর্জনে সফল হবেন।

প্রকৃতপক্ষে, এক্ষেত্রে সফলতার সম্ভাবনা শূন্য। সিন্দুকে মুদ্রা জমা পড়তে থাকলে বাজারে মুদ্রার সংখ্যা (money in circulation) কমে আসবে। তখন সবার হাতে হাতে আর আগের মতো টাকা-পয়সা থাকবে না। সবার হাতে টাকা কমে গেলে অর্থনীতিতে মূল্যহ্রাস (deflation) দেখা দিবে বা সবকিছুর দাম কমে

---

২ সূত্র : http://la.utexas.edu/users/hcleaver/368/368AristotlePolitics.html

যাবে, এমনকি বাড়ি ভাড়াও কমে যাবে। তখন ভাড়াটিয়া ময়না এসে বলবে, 'বুলবুল সাহেব, বাড়ি ভাড়া কমান, অথবা অন্য কোথাও চলে যাব।'

তিনি রাজি না হলে ময়না চলে যাবে এবং খালি বাড়ি আগের দামে ভাড়া দিতে চাইলে নতুন প্রার্থী টুনটুনি বলবে, 'এখন তো সব কিছুর দাম কমে গেছে। আপনি এত ভাড়া রাখছেন কেন? ভাড়া কমাতে পারলে এই বাড়িতে উঠবো, অথবা অন্য কোন বাড়ি দেখব।'

অর্থাৎ, নিরুপায় হয়েই বুলবুল সাহেব বাড়ির ভাড়া কমাবেন। এর পরেও মুদ্রা সিন্দুকে ভরে রাখতে থাকলে যতই দিন যাবে, ততই সবকিছুর দাম আরো কমতে থাকবে। একসময় টুনটুনিও এসে বলবে, 'বুলবুল সাহেব, বাড়ি ভাড়া কমান, অথবা অন্য কোথাও চলে যাব।' তিনি রাজি না হলে টুনটুনি চলে যাবে এবং খালি বাড়ি আগের দামে ভাড়া দিতে চাইলে নতুন প্রার্থী মুনিয়া বলবে 'ভাড়া কমাতে পারলে এই বাড়িতে উঠব, অথবা অন্য কোনো বাড়ি দেখব।'

এভাবে ক্রমান্বয়ে ভাড়া কমাতে থাকলে, ২০ বছরে ২০০টি মুদ্রা সংগ্রহ করাই অসম্ভব হয়ে যাবে। আর মানুষ যেহেতু মুদ্রা ছাড়া চলতে পারে না, সব কটি মুদ্রা বুলবুল সাহেবের দ্বারা সংগ্রহ করা গাণিতিকভাবেই অসম্ভব।[৩]

---

৩ একটি ধর্মীয় শিক্ষা নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই উদাহরণে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে বুলবুল সাহেব সিন্দুকের কোন মুদ্রা দান করবেন না এবং ধারও দিবেন না। কেবল মাত্র সঞ্চয় করে যাবেন। এভাবে সঞ্চয় করাতে মুদ্রা প্রবাহ কমে গিয়ে ওনার ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। দ্বিতীয়ত, এভাবে মুদ্রা কুক্ষিগত করে রাখাতে দ্বীপের অধিবাসীদেরও মুদ্রা সংকটে পড়তে হবে। তিনি যদি সঞ্চিত মুদ্রা বিনা সুদেও ঋণ দিতেন, অর্থনীতিতে মুদ্রা প্রবাহ বজায় থাকতো, দ্বীপে মুদ্রা সংকট সৃষ্টি হতো না এবং বাড়ির ভাড়া কমাতে তিনি বাধ্য হতেন না। প্রকৃতপক্ষে, ধার দেওয়া হত তাঁর নিজের আয় রোজকারের জন্যই উত্তম। তার পাশাপাশি অধিবাসীদের জন্যও স্বস্তিকর। ইসলাম ধর্মেও ধার দেওয়াকে অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। কোরানে উল্লেখ আছে—

'কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকে উত্তম ঋণ প্রদান করবে? ফলে আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ, বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। আর আল্লাহতায়ালাই রিজিক সংকুচিত করেন ও বৃদ্ধি করেন। তোমাদের তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।' (সুরা বাকারাঃ ২৪৫)

তবে একটি সমস্যা হচ্ছে ক্রমান্বয়ে ধার দিতে থাকলে সবাই বুলবুল সাহেবের কাছে ঋণী হয়ে পড়ত। এর একটি সমাধান হচ্ছে জাকাত এবং অনুদান। স্বেচ্ছায় দান করা হচ্ছে অনুদান। অপরপক্ষে, যাকাত হচ্ছে বাধ্যতামূলক দান। জাকাত ব্যবস্থায় সব মুসলিম নর-নারীকে সঞ্চিত তরল সম্পত্তির, যেমন মুদ্রা, গবাদিপশু ইত্যাদির চল্লিশ ভাগের এক ভাগ প্রতি বছর দান করতে হয়। এই ব্যবস্থায় বুলবুল সাহেব মোট ৪০০ মুদ্রা এবং ঋণ জমানোর পরে বার্ষিক যাকাত আসতো ১০ মুদ্রা, যা বাড়ি ভাড়ারই সমান। অর্থাৎ, জাকাত থাকলে ৪০০ মুদ্রার চেয়ে বেশি সঞ্চয় করা হত গাণিতিকভাবেই অসম্ভব।

প্রশ্ন হচ্ছে বুলবুল সাহেব এই কাজ করতে না পারলে সুদের কারবারি কীভাবে পারলো? একজন ব্যবসায়ীর মুদ্রা কুক্ষিগত করার স্বপ্ন নির্দ্বিধায় তার নাগালের বাইরে চলে গেল, কিন্তু একজন সুদি কারবারির সব মুদ্রা সংগ্রহ করার স্বপ্ন তার সাধ্যের মধ্যেই থেকে গেল। এর রহস্য কী?

এর রহস্য হচ্ছে, ঋণ দিলে মুদ্রাগুলো কারবারির সিন্দুকে লুকিয়ে থাকে না। মুদ্রা হাত বদলায়, তবে মালিকানা বদলায় না। তাই সুদের চক্রে মুদ্রার মালিকানা কুক্ষিগত করতে থাকলেও মুদ্রা প্রবাহে সংকট সৃষ্টি হয় না। রিবা যখন ঋণ দিবে তখন পুনরায় মুদ্রাগুলো বাজারে প্রবেশ করবে। এভাবে সোনার মোহর কেবল রিবার সিন্দুকে বসে থাকবে না, সবার হাতে হাতে ঘুরে বেড়াবে। তাই মুদ্রা সংকট কিংবা মূল্যহ্রাস কোনটা হওয়ারই ভয় নেই।

তারপরেও আমাদের অনেকেরই হয়তো এটা মানতে বড্ড কষ্ট হয় যে, সুদের চক্রে সব মুদ্রা একজন ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হবে। একটিবার ভেবে দেখুন তো, কৃষক তোতা মিয়া তার আম বাগান ১ বছরের জন্যে সুদে ইজারা দিলে কী হতো?

সুদে ইজারার শর্ত অনুযায়ী ইজারাগ্রহীতা বাগানের সব আম ভোগ করতো কিন্তু এর বিনিময়ে তোতা মিয়া এক টাকাও নিতো না। সে বরং তার পরিবর্তে বাগান ভাড়ার সম-মূল্যের ছোট এক টুকরা জমি ফেরত চাইতো। এভাবে তোতা মিয়ার জমির পরিমাণ বেড়ে যেত। পরের বছর সে নতুন পুরাতন সব জমি ইজারা দিয়ে আরো বেশি পরিমাণ জমি মালিকানায় নিতো। এভাবে সে আরো বেশি বাগানের মালিক হতো। এধরনের কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকলে একসময় তোতা মিয়া সব বাগানের মালিক হয়ে যেত।

সুদ কারবারিরাও ঠিক তেমনি করে সুদের চক্রে সব মোহর খাটিয়ে বাদ বাকি সবার সব মোহরের মালিক বনে যাবে। সুদ চর্চা সাধারণত মুদ্রা দিয়ে হয়ে থাকলেও সুদ যেকোন বস্তু দিয়েই করা সম্ভব। শর্ত হচ্ছে, একজন যা দিবেন ঠিক একই বস্তু তার চেয়ে বেশি পরিমাণে ফেরত নিবেন।

আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, সব মুদ্রা সিন্দুকে জমা করে রাখলে বুলবুল সাহেব যদি বাড়ি ভাড়া কমাতে বাধ্য হন, একই কাজ করলে সুদ কারবারি কি সুদের হার কমাতে বাধ্য হবে?

উত্তর হচ্ছে, না। মুদ্রা সংকট সৃষ্টি হলে, সুদ কারবারি আরো উপকৃত হবে। কারণ, মানুষের হাতে মুদ্রা কমে গেলে, সবাই মুদ্রা পাবার জন্য মরিয়া

হয়ে যায়। এর ফলে পূর্বে যারা ঋণের আওতার বাইরে ছিল, তারাও মুদ্রাশূন্য হয়ে ঋণ নিতে মহাজনের কাছে ভিড় করে। এক্ষেত্রে সুদের হার কমা তো দূরে থাক, বরং আরো বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে প্রার্থীর সংখ্যাও বেড়ে যায়।

মুদ্রা সংকট হলো সুদ কারবারির সোনার হরিণ, কারণ বাজারে মুদ্রার পরিমাণ কমে যাওয়ার সাথে সাথে সুদের চাহিদা অকল্পনীয় হারে বেড়ে যায়। এভাবে মুদ্রা সংকট সৃষ্টি করে ঋণের পরিধি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর করা যায়। অর্থাৎ একটি অর্থনীতিতে ঋণ নেওয়ার সর্বোচ্চ কোন সীমা নেই।

পূর্বে যে তর্কের খাতিরে ধরে নিয়েছিলাম, কেবল ১০০টি মোহর ঋণ দেবার পর রিবা বাড়তি কোন ঋণ প্রদান করতে পারবে না, তা একেবারেই সঠিক ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়

বর্তমান বিশ্বের অর্থ ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা রূপসাগরের তুলনায় অসীমগুণে জটিল। এখন প্রতিটি রাষ্ট্রের অর্থনীতিই সময়ের সাথে বড় হচ্ছে এবং বছর বছর যুক্ত হচ্ছে নতুন নতুন সব প্রযুক্তি। এমন পরিবর্তনশীল বিশ্বে, উপরে বর্ণিত ফলাফল আমাদের নিজেদের জীবনে ঘটার আশংকা করতে পারি কি?

খেয়াল করুন, রূপসাগরের অর্থনীতির আকৃতি ও জনসংখ্যা উভয়ই সময়ের সাথে ক্রমবর্ধমান। কিন্তু অর্থনীতির আকৃতি সময়ের সাথে যত বড়ই হতে থাকুক না কেন, তাতে কিছু যায় আসে না। রূপসাগরের অর্থনীতি ২১ বছরে ২১ গুণ বড়ও হলেও, সব মুদ্রা রিবার হাতেই আসবে। কারণ সুদ হচ্ছে মুদ্রাকেন্দ্রিক লেনদেন। মুদ্রার সংখ্যা সমান থাকলে সুদের চক্রে সব মুদ্রা রিবার হাতেই আসবে। এমনকি রিবা ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না পারলেও, এই ফলাফলে ন্যূনতম কোন পরিবর্তন আসবে না।

কিন্তু বর্তমান যুগে আমরা স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করি না এবং আধুনিক বিশ্বে মোট মুদ্রার সংখ্যা রূপসাগরের ন্যায় স্থির না; সময়ের সাথে বর্ধনশীল। সেক্ষেত্রে, ফলাফল কী হবে?

এই প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে বছর বছর মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এমন একটি রূপকল্পের প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, রূপসাগরের অধিবাসীরা মুদ্রা হিসেবে কড়ি ব্যবহার করলে এবং প্রতি বছর সাগর থেকে নতুন নতুন কড়ি ভেসে আসলে, আমরা সেখানে সুদের প্রভাব বিশ্লেষণ করেও উপরের প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারব। তাই, আধুনিকতার সুরের সাথে তাল মিলিয়ে, আমরাও মনে করি—

রূপসাগরের অধিবাসী আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, প্রথম প্রজন্মের জীবন ও তরীর পরে বুলবুল সাহেবদের ছেলেমেয়েরাও এখন বড় হয়ে গিয়েছে। অর্থনীতির আকৃতি বড় হওয়ায় এবং মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় সবাই মিলে ঠিক করল, এখন থেকে সাগর পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া

কড়ি দিয়েই তারা লেনদেন করবে এবং যেই ব্যক্তি সৈকতে ভেসে আসা নতুন কড়ি সংগ্রহ করবে, সেই তার মালিক বলে বিবেচিত হবে।

সাগর থেকে ভেসে আসা কড়ি কীভাবে সোনাকে প্রতিস্থাপন করবে তা বুঝতে চলুন, টাকা নামের রহস্যময় বস্তুটার সাথে পরিচিত হই।

আপনি হয়তো ভাবছেন, সাগর থেকে ভেসে আসা কড়ি কীভাবে সোনাকে প্রতিস্থাপন করবে? একথা জেনে খুশি হবেন যে, আপনি একা নন, আমরা প্রায় সবাই এমন প্রশ্ন করে থাকি। কারণ, আমরা অনেকেই টাকার মান নির্ধারণের পদ্ধতিটি জানি না। এবার চলুন মূল আলোচনা শুরু করার আগে টাকা নামের রহস্যময় বস্তুটাকে জেনে নেই।

[প্রিয় পাঠক, আপনাকে বলছি, চাইলে কড়ির পরিবর্তে সোনার মোহর এবং সাগর তীরের জায়গায় নতুন নতুন সোনার খনি উল্লেখ করে বিশ্লেষণ চালিয়ে যাওয়া যেত। সেক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ একই ফলাফল আসতো। কেবল মাত্র বর্ণনার বৈচিত্র্য এবং নতুন নতুন মুদ্রার সাথে আপনাদের পরিচিত করানোর স্বার্থেই কড়ির উদাহরণ টেনে আনা হল।]

টাকা কী

টাকা (বা মুদ্রা) নামক জিনিসটার নিজস্ব কোন মূল্য নেই। পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাপেক্ষে এর মূল্যমান নির্ধারিত হয়। সোজা বাংলায়, কোন অঞ্চলের মানুষ যেটাকে মূল্যবান ভাববে সেটাই মূল্যবান এবং যেটাকে মূল্যহীন ধরে নেবে, সেটাই মূল্যহীন! সেকারণেই টাকা একই সাথে মহামূল্যবান, আবার সম্পূর্ণ মূল্যহীনও হতে পারে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক। ধরুন, বিমান দুর্ঘটনায় আপনি এক দুর্গম আদিবাসী পল্লিতে গিয়ে পতিত হলেন। সে যাত্রায়, আপনি প্রাণে বেঁচে গেলেন এবং আপনার সাথে থাকা কিছু মালামাল ও টাকা পয়সাও অক্ষত রয়ে গেল। সুস্থ হয়ে খাবার কিনতে বাজারে গিয়ে দেখলেন, সবাই ছাগলের শিং দিয়ে লেনদেন করছে। কেউ ব্যাংক নোট ছুঁয়েও দেখছে না। তখন আপনি কী করবেন?

আপনার সাথের কিছু মালামাল বিক্রি করে অথবা কাজ খুঁজে শ্রমের বিনিময়ে কতক ছাগলের শিং অর্জন করে খাবার কিনবেন। তাই না? লক্ষ্য করুন, এমন একটি বিচ্ছিন্ন পল্লিতে আপনি সব কিছু বিক্রি করে ছাগলের শিং অর্জন করতে পারবেন। কারণ, সেই সমাজে আপনার টাকার কোন মূল্য নেই।

আবার, যখন আপনি যখন আদিবাসী পল্লি থেকে নিজ শহরে এক ব্যাগ ছাগলের শিং হাতে ফিরে আসবেন, কেউ তা ছুঁয়েও দেখবে না। কারণ শহুরে সমাজে ছাগলের শিং একেবারেই মূল্যহীন। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে এভাবেই আপনার অর্থ মূল্যমান হারিয়ে ফেলে বা ফেরত পায়।

টাকার যে নিজস্ব কোন মূল্য নেই, তা গভীরভাবে বোঝার জন্য কল্পনা করুন— আপনি এমনই একটি নির্জন দ্বীপে পতিত হলেন যেখানে জন মানবের কোনো চিহ্নই নেই। সেখানে আপনার টাকা-পয়সা কিংবা সোনার মোহর কী কাজে আসবে? কোনো কাজেই আসবে না। কারণ এগুলোর নিজস্ব কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই। আর যেই বস্তুর কোনো ব্যবহারিক উপযোগিতা নেই, তার নিখাদ কোনো মূল্যও নেই।

প্রকৃতপক্ষে নানাবিধ অপ্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারা মুদ্রা তৈরি হতে পারে। প্রাচীন বাংলায় বিনিময়ের মাধ্যম 'কড়ির মুদ্রা' এর প্রচলন ছিল। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ অঞ্চলে পাখির পালককে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। এছাড়া সোনা, রূপা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রার বিস্তীর্ণ ব্যবহার ছিল ইতিহাস জুড়ে। কড়ি বা পাখির পালকের মতো সোনা এবং রূপাও এক অর্থে 'প্রায়' অপ্রয়োজনীয় বস্তু। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে, কিছু শিল্প-কারখানা ছাড়া আমরা সোনা ও রূপাকে কেবল অলঙ্কার হিসেবেই ব্যবহার করে থাকি। আমরা ওগুলোকে মূল্য না দিতে মনঃস্থ করলে, সোনার বা রূপার টুকরাও হয়তো ধূলিকণার মতো রাস্তার ধারে পড়ে থাকত। কারণ সোনা বা রূপা এমন কিছু না, যা ছাড়া আমরা চলতে পারি না। সেই তুলনায় খাবার, পানি, লবণ, লোহা, তামা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু। এগুলো ছাড়া হয় আমরা একেবারেই চলতে পারি না অথবা আমাদের চলাটা অত্যন্ত মুশকিল হয়ে পড়ে।

তাহলে মুদ্রার মূল্যমান আসে কোথা থেকে?

মুদ্রার মূল্যমান নির্ভর করে মুদ্রার মোট পরিমাণ এবং গতির উপর (অর্থাৎ, একটি অর্থনীতিতে কত দ্রুত টাকা হাত বদল করছে তার উপর)। সাধারণত টাকার গতি বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। এজন্য আমরা বলতে পারি, টাকার পরিমাণ যত দ্রুত বৃদ্ধি পায়, মূল্যস্ফীতিও সেই সাথে সমানতালে বৃদ্ধি পায়।

বিষয়টি সহজভাবে বোঝা যায় এভাবে, মনে করেন কোন এক বছর টমেটোর বাম্পার ফলন হয়েছে। বাজারে অনেক বেশি টমেটো থাকায়, স্বভাবতই এর দাম পড়ে যাবে। ঠিক তেমনি, কোন কারণে যদি সাগর থেকে

অনেক বেশি কড়ি ভেসে আসে, কড়ির দামও কমে যাবে। সোনার খনি আবিষ্কার হলে, সোনার দাম কমে যাবে। একইভাবে, টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও সব কিছুর দাম বেড়ে যাবে বা টাকার দাম কমে যাবে।

মুদ্রার মূল্যমানের রহস্য বোঝা গেলে এবার আলোচনা করা যাক মুদ্রার বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

মুদ্রা হিসেবে আমরা যা কিছুই ব্যবহার করি না কেন, তাদের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। মুদ্রার একটা বিশেষ দিক হলো, এর পরিমাণ ও সরবরাহ সীমিত। গাছের পাতা, কিংবা সমুদ্রের ধূলিকণার মতো বিপুল জোগানের কোনো বস্তুকে আমরা মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। এমনটি করলে হয়তো বা আমাদেরকে এক বস্তা টাকার বিনিময়ে এক সের চাল কিনতে হতো। সেক্ষেত্রে, মুদ্রা তার বহনযোগ্যতার গুণটা হারিয়ে ফেলত।

মুদ্রার আরেকটি চরিত্র হলো, একে সঞ্চয় করে রাখা যায়। পচনশীল দ্রব্যাদি যেমন গাছের পাকা ফল বা সমুদ্রের তাজা মাছ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহারের অনুপযোগী। এগুলো মুদ্রা হলে, আয় করার দুই একদিনের মধ্যেই সব ব্যয় করে ফেলতে হতো। সিন্দুকে যত্ন করে সঞ্চয় করে রাখা যেত না। সুতরাং সহজে নষ্ট হয় না, এমন উপকরণকেই 'মুদ্রা' হিসেবে আমরা বাছাই করব।

এসবের পাশাপাশি মুদ্রাকে হতে হবে সহজে বিভাজনযোগ্য, অর্থাৎ চাইলেই যেন একে ছোট-বড় বিভিন্ন অংশে আয়েশে ভাগ করে ফেলা যায়। খাদ্যশস্য বা লবণ বিভাজনযোগ্য বিধায় এদেরকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করা যায়। আমরা চাইলেই এক ছটাক, আধ ছটাক বা পৌনে এক সের লবণ বিনিময় করতে পারি, অর্থাৎ নিজের প্রয়োজনমাফিক কম-বেশি করতে পারি। এটি হচ্ছে মুদ্রার বিভাজনযোগ্যতা। কোন প্রাণী বা গাড়ি বিভাজনযোগ্য নয় বলেই, আমরা এদেরকে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করতে পারি না। যেমন একটি প্রাণীকে দুই ভাগ করলে, সে মারা যাবে। আবার একটি গাড়িকে তিন টুকরা করলে, গাড়িটিও অকেজো হয়ে যাবে। অর্থাৎ, বিভাজন করলে যেই বস্তু তার গুণগত মান হারিয়ে ফেলে, সেই বস্তু মুদ্রা হতে পারে না।

মুদ্রার আরেকটি লক্ষণ হচ্ছে বহনযোগ্যতা। অতিরিক্ত ভারি বলেই সীসাকে আমরা কোনদিন মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করিনি।

সবশেষে, মুদ্রাকে হতে হবে সমতুল্য। দুইটি একই মূল্যমানের মুদ্রা গুণে, মানে, আকৃতিতে এবং প্রকৃতিতে একই রকম হবে। যেমন— দুটি ১

আনার মোহর সব বিবেচনাতেই সাদৃশ্যপূর্ণ। আবার এক কেজি বিন্নি ধান স্থানভেদে অভিন্ন গুণসম্পন্ন। দুটি সমমানের মুদ্রা অনুরূপ না হলে, লেনদেনে সমঝোতা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, দুটি গরু বা দুইটি কাঁঠাল কখনও সম্পূর্ণ একরকম হয় না। তাই এগুলো দিয়ে লেনদেন করতে গেলে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে না। একারণে, এগুলো মুদ্রা হিসেবে অচল।

মুদ্রার পরিমাণ সীমিত হলেও এর একটি গুণ হচ্ছে, একে পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। যেমন স্বর্ণ বা রৌপ্যের খনি আবিষ্কার করার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। আবার মুদ্রা হিসেবে কড়ি ব্যবহার করলে, প্রতি বছরই সাগরের তীর হতে কুড়িয়ে কুড়িয়ে আমরা সেগুলোর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করতে পারি।

নতুন মুদ্রা আসার পরেও অর্থনীতির আকৃতি পূর্ববৎ থাকলে, মুদ্রার মূল্যমান আগের তুলনায় কমে যাবে বা মূল্যস্ফীতি দেখা দিবে। আবার, অর্থনীতির আকৃতি আগের মতো থাকলে কিন্তু মুদ্রার পরিমাণ কমলে, মূল্যহ্রাস দেখা দিবে।

দেখতে দেখতে মুদ্রা কাকে বলে, এর বৈশিষ্ট্য ও আচরণ আপনি চমৎকার শিখে গেলেন। কেউ আমাকে এমন গল্পে গল্পে শেখালে, অনার্সের সিজিপিএ-টা হয়তো আরো ভাল হত!

টিকা—টাকা

সময় এবং পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে টাকা কিভাবে মূল্যমান হারাতে পারে তার একটি চমৎকার উদাহরণ হচ্ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কয়েকবছর পরের জার্মানি। সেই সময় জার্মানরা ময়লা আবর্জনার মতো টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিতে শুরু করে। এমনকি ঝাড়ুদারকে রাস্তা থেকে ঝাড়ু দিয়ে মার্ক (জার্মান মুদ্রা) কুড়িয়ে ডাস্টবিনে ফেলতে দেখা যায়।

এর কারণ বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধের ঋণ ও জরিমানা প্রদান করতে গিয়ে, জার্মানিকে বিপুল পরিমাণ মুদ্রা (জার্মান মার্ক) ছাপাতে হয়। এতে এক সময় মার্কের মূল্য এতই কমে যায় যে, এক বান্ডেল পুরানো নোটের তুলনায় এক বান্ডেল টয়লেট পেপার বেশি মূল্যবান হয়ে উঠে। তাই মানুষ কষ্ট করে বাজার থেকে টয়লেট পেপার না কিনে, পুরানো নোট দিয়েই শৌচ কাজ সেরে ফেলত। কেউ আবার বিরক্ত হয়ে এই মূল্যহীন নোট জঞ্জাল গণ্য করে ফেলে

দিতে শুরু করল। তাই রাস্তাতে আবর্জনার স্তূপের মতো মার্ক পড়ে থাকতে দেখা যায় এবং ঝাড়ু দিয়ে তা পরিষ্কার করে নিতে হয়। এভাবেই এক কালের মূল্যবান মার্ক সময়ের ব্যবধানে হয়ে যায় মূল্যহীন।

ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ও চক্রবৃদ্ধি সুদ

মুদ্রা কী, তা আপনারা বেশ চমৎকার বুঝলেন। এবারে মূল আলোচনা শুরু করার আগে, একটি বিষয় খেয়াল করেন— আমরা আমাদের কাঠামোটাতে চিন্তার নতুন আরেকটি মাত্রা যুক্ত করেছি। প্রথম অধ্যায়ে জনসংখ্যা ছিল স্থির, অর্থনীতি ছিল স্থবির এবং মুদ্রার সংখ্যা ছিল সীমিত। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, আমরা প্রথম দুইটি শর্ত তুলে দিয়েছিলাম। তবে এখন পর্যন্ত মুদ্রার পরিমাণ ছিল স্থির। এবার আমরা সেই নির্ধারকটাও তুলে দিচ্ছি, অর্থাৎ, মুদ্রার সংখ্যা হবে পরিবর্তনশীল। এই ক্রমবর্ধমান মুদ্রাব্যবস্থায় সুদের প্রভাব এবং এর দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল কেমন হতে পারে, সেটা বুঝে নিতে চলুন রূপসাগরের তীরে আমাদের তরী ভিড়াই।

এখন থেকে, রূপসাগরের মুদ্রা হচ্ছে কড়ি। বর্তমানে, সাকুল্যে দেশটিতে ৫,০০০টি কড়ি আছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, ফি বছর সাগর থেকে ১০০টি নতুন কড়ি ভেসে আসে এবং যে যার সময় সুযোগ মতো সৈকত থেকে কড়িগুলো সংগ্রহ করে আনে। বাৎসরিক আয় রোজকারের পাশাপাশি সাগর পাড়ে কুড়িয়ে পাওয়া কড়িও অধিবাসীদের জীবনে খণ্ডকালীন আয়ের মতো কল্যাণ বয়ে আনে।

এমন একটি অর্থনীতিতে, এখন পর্যন্ত করা বিশ্লেষণগুলো কতটা কার্যকর? এখন কি সুদ এবং মুদ্রাব্যবস্থা সাম্যাবস্থা বজায় রেখে হাতে হাত ধরে আগাতে পারবে?

মনে করি, রিবার ছেলে রাজা রূপসাগরে সুদের সেই গদির মালিক। প্রতি বছর রাজা ১,০০০টি কড়ি ঋণ দেয় এবং এই ঋণের বিপরীতে ১০ শতাংশ হারে মোট ১০০টি কড়ি সুদ নেয়। এখন যেহেতু সাগর থেকে বছরে ১০০টি নতুন কড়ি ভেসে আসছে, সব সুদ সিন্দুকে জমা করলে মুদ্রাব্যবস্থায় কোন সংকট সৃষ্টি হবে না। তবে শর্ত হচ্ছে, মোট ঋণের পরিমাণ সর্বোচ্চ ১,০০০টি কড়িতে স্থির রাখতে হবে, বাড়ানো যাবে না। এমনটি করতে পারলে প্রতি বছর রাজার ভাণ্ডারে জমা হওয়া কড়ির সংখ্যা এবং নতুন ভেসে আসা কড়ির সংখ্যা সমান সমান থাকবে। একারণে, বাজারে মোট ৫,০০০টি

কড়ি সর্বদা চলমান থাকবে এবং সুদ থাকা সত্ত্বেও মুদ্রার ভারসাম্য বজায় থাকবে।[৪]

কিন্তু এই ভারসাম্য বাস্তবসম্মত নয়। এই পদ্ধতিতে সিন্দুকে কড়ির সংখ্যা কেবল বাড়তেই থাকবে এবং রাজার ঘরে অলস কড়ির পাহাড় তৈরি হবে। কোন 'বুদ্ধিমান' ব্যক্তিই অলস কড়ির পাহাড় চির অবহেলায় ফেলে রাখতে পারে না। আর সুদ ব্যবসায়ীর জন্য তো তা অকল্পনীয়। এক্ষেত্রে বরং, তিনটি ঘটনা ঘটতে পারে।

১. কড়িগুলো পুনরায় ঋণ হিসেবে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
২. অন্য কোনো ব্যবসাতে বিনিয়োগ করা যেতে পারে।
৩. ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করে ফেলা যেতে পারে।

আমরা প্রতিটি প্রেক্ষাপটের চিত্রই আলাদা আলাদা বিশ্লেষণ করব। তারপর মিশ্র কৌশলের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখবো।

১. পুনরায় ঋণ দিলে কী হত?

সুদের হার দশ শতাংশ হলে, ১,০০০টি কড়ি ঋণের বিপরীতে প্রতি বছর সুদ আসতো ১০০টি কড়ি। তাহলে প্রথম বছর শেষে সুদাসল (রাজার পুঁজি) দাঁড়াতো ১,১০০টি কড়িতে। দ্বিতীয় বছরের প্রারম্ভে রাজা ঋণ দিতে পারতো ১,১০০টি কড়ি, যার বিপরীতে সুদ আসতো ১১০টি কড়ি।

লক্ষ্য করুন, বছরে ১০০টি কড়ি সাগর থেকে ভেসে আসলে যে সাম্যাবস্থা বজায় থাকত, তা দ্বিতীয় বছরেই ভেঙে যাচ্ছে। সাম্যাবস্থা বলতে বুঝানো হয়েছে, মহাজন সুদ হিসেবে যা নিয়ে নিচ্ছে, তার সমান বা অধিক পরিমাণ কড়ি প্রতি বছর সাগর থেকে ভেসে আসছে। কারণ ভেসে আসা কড়ির সংখ্যা যদি কম হয়, সব মুদ্রাই সুদ কারবারির পেটে চলে যাবে। এবার দেখুন, দ্বিতীয় বছর শেষে, সুদাসল হবে ১,২১০টি কড়ি যার উপর ১০ শতাংশ হারে মোট সুদ আসবে ১২১টি কড়ি। এভাবে তৃতীয় বছর শেষে, সুদাসল হবে ১,৩৩১টি কড়ি।

---

৪ সিন্দুকের ভেতরে পড়ে থাকা অব্যবহৃত কড়ি এবং সমুদ্রের তলদেশে পড়ে থাকা গুপ্ত মুদ্রা উভয়ই কার্যত মূল্যহীন। তাই অর্থনীতিতে এদের প্রভাব হবে শূন্য।

এবার নিচের ছকটি লক্ষ্য করুন :

বছর	ঋণ	সুদের হার ১০ % অনুযায়ী প্রাপ্ত সুদের পরিমাণ	সুদ+আসল
১	১০০০	১০০	১১০০
২	১১০০	১১০	১২১০
৩	১২১০	১২১	১৩৩১
৪	১৩৩১	১৩৩.১	১৪৬৪.১
৫	১৪৬৪.১	১৪৬.৪	১৬১০.৫
৬	১৬১০.৫	১৬১	১৭৭১.৫
৭	১৭৭১.৫	১৭৭.১	১৯৪৮.৬
৮	১৯৪৮.৬	১৯৪.৮	২১৪৩.৪
৯	২১৪৩.৪	২১৪.৩	২৩৫৭.৭
১০	২৩৫৭.৭	২৩৫.৭	২৫৯৩.৪
১১	২৫৯৩.৪	২৫৯.৩	২৮৫২.৭
১২	২৮৫২.৭	২৮৫.৩	৩১৩৮
১৩	৩১৩৮	৩১৩.৮	৩৪৫১.৮

ছকে দেখুন, প্রতি বছর সাগর থেকে ২০০টি কড়ি ভেসে আসলে, ৯ম বছরে সাম্যাবস্থা ভেঙে যাচ্ছে। আবার প্রতি বছর সাগর থেকে ৩০০টি কড়ি ভেসে আসলেও, ১৩ তম বছরেই সাম্যাবস্থা ভেঙে যাচ্ছে।

উপরের ছকে, কেবলমাত্র প্রথম তেরো বছরের হিসাব দেখানো হয়েছে। ছকটি আরো বড় করলে দেখা যাবে ভেসে আসা কড়ির সংখ্যা ৪০০, ৭০০ বা ১২০০ যত বেশিই হোক না কেন, সুদের চক্র চলতে থাকলে এক সময় সব কড়িই সুদি মহাজনের হাতে চলে যাবে। এমনকি সুদের হার মাত্র ৫ শতাংশ বা ২ শতাংশ হলেও ঠিক একই ফলাফল সংগঠিত হবে, কেবল মাত্র কিছু বেশি সময় লাগবে। এটিই হলো চক্রাকারে বৃদ্ধির মায়াজাল, যা প্রকৃতির সকল স্থানে দেখা যায়।

অনেকে মনে করে থাকতে পারেন, চক্রবৃদ্ধিতে সুদ না নিলেই, সুদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব। আবার কেউ কেউ মনে করেন

যে, ঋণ পরিশোধে অপারগ ব্যক্তিকে সময় বাড়িয়ে দিলে বা বিশেষ প্রয়োজনে সুদ মওকুফ করে দিলে, সুদ সমাজের কোনো ক্ষতি করবে না। এই ধারণাগুলো ভয়ানক ভুল।

রূপসাগরের মহাজন রাজা মিয়া কিছু গ্রাহকের সুদ ক্ষমা করে দিলে অথবা ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ গ্রাহকদের কিছু বাড়তি সময় দিলেও, সব মুদ্রা তার মালিকানাতেই কেন্দ্রীভূত হবে। কেবল পূর্বের তুলনায় কিছুটা বেশি সময় লাগবে।

উপর্যুক্ত ছকের বিস্ময়কর চিত্রটি খেয়াল করুন। এখানে সরল হারে সুদ নেয়া সত্ত্বেও মোট সম্পদের পরিমাণ (সুদাসল) চক্রাকারে বেড়ে যাচ্ছে। কারণ, প্রকৃতিতে সরল বৃদ্ধি বলে কিছু নেই, সব চক্রবৃদ্ধি। এই নিয়ম কেবল মাত্র সুদ নয়, ব্যবসাতেও প্রযোজ্য। দেখুন কীভাবে...

রূপসাগরের নতুন প্রজন্মের জনৈক মধুর সওদাগর বাদশা মিয়া। দ্বীপের দক্ষিণের উত্তাল সাগরপাড়ে অবস্থিত কেওড়া বনের মৌয়ালদের থেকে তিনি মধু কিনে আনেন। বাদশা মিয়া মৌয়ালদের থেকে যেই দামে মধু কিনেন, বাজারে তা ২০ শতাংশ লাভে বিক্রি করেন। প্রথমে ১০০ কড়ি পুঁজি নিয়ে বাদশা মিয়া ব্যবসা শুরু করলেন। প্রথমবার তিনি ১০০ কড়ি মূল্যের মধু কিনে সেই মধু ১২০ কড়িতে বিক্রি করলেন। তারপর বাদশা মিয়া ১২০ কড়ির মধু কিনে বাজারে বিক্রি করলেন ১৪৪ কড়িতে। তারপর, ১৪৪ কড়ির মধু কিনে বিক্রি করলেন ১৭৩ কড়িতে, তার পরবর্তীতে ১৭৩ কড়ির মধু কিনে ২০৭ কড়িতে বিক্রয় করলেন। অথচ সরল লাভে ১০০, ১২০, ১৪০, ১৬০, ১৮০, ২০০ কড়ি এভাবে আগানোর কথা ছিল। তাহলে এমন হলো কেন?

এমন হবার কারণ হচ্ছে প্রতিবার তিনি অধিক পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছেন যা মোট সম্পদকে চক্রাকারে বৃদ্ধি করে দিয়েছে। প্রকৃতির সকল স্থানেই এমনটি দেখা যায়। যেমন— জনসংখ্যা বৃদ্ধি, তেজস্ক্রিয়তা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। সুদও তার ব্যতিক্রম নয়। সুদের হার যত সরলই দেখাক না কেন, ঋণের পরিমাণ চক্রাকারে বৃদ্ধি পায় এবং ঋণের হাত ধরে সুদও চক্রাকারে বৃদ্ধি পেতে থাকে (চার্টে দেখুন)।

এই নিয়ে ছোট্ট একটি কিচ্ছা শোনা যাক...

দুর্জনের ছল

ভারতবর্ষের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক সম্রাট আকবর। সে বছর আচানক এক ভয়ঙ্কর বন্যায় রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকার ধান বিনষ্ট হয়ে যায়। কীভাবে রাজকার্য চালাবেন, কোথা থেকে এত বড় সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা দিবেন, তা নিয়ে সম্রাট গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। উপায়ান্তর না পেয়ে তিনি ধনকুবের সভাসদ মানসিংহের নিকট ১০,০০০টি স্বর্ণমুদ্রা সহায়তা চেয়ে চিঠি পাঠালেন। সম্রাটের চিঠি মানসিংহকে বেজায় তুষ্ট করল। যথারীতি বিনয়াবনত হয়ে চিঠির ফিরতি জবাবে তিনি লিখলেন,

> 'মহামান্য সম্রাট,
>
> আমার প্রণাম নিবেন। আপনি বিপদে আছেন জেনে অতিশয় ব্যথিত হলাম। আমি আজই ১০ হাজারটি মোহর আপনার নিকট পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি আপনার সময় সুযোগ মতো সামর্থ সাপেক্ষে এই ঋণ পরিশোধ করে দিলেই হবে। সাধারণত, আমি সবার থেকে ১৪ শতাংশ সুদ রাখি। তবে, আপনি আমার বিশ্বস্তজন বিধায় প্রতি বছর মোট ঋণের উপর সুদ রাখছি মাত্র ১২ শতাংশ করে। আপনার এই বিপদের দিনে সাহায্য করতে পেরে আমি আজ নিজেকে বড়ই ধন্য মনে করছি।
>
> ইতি
>
> শ্রী মানসিংহ'

বিপদের দিনে মানসিংহের সাহায্য সম্রাটকে বড় পরিতৃপ্ত করল। সেই বিপর্যয় পেরিয়ে পরের বছরগুলোতে ধীরে ধীরে দেশের অবস্থার উন্নতি হলো। রাজ-কোষাগার আবারো ধনে রত্নে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলো। তাই ঋণ নেওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যেই সুদাসল পুরোটাই পরিশোধ করার মতো অবস্থা ফিরে আসলো। একদিন সম্রাট তার প্রধানমন্ত্রী বীরবলকে ডেকে পাঠালেন। দরবারে হাজির হলে বীরবলকে তিনি বললেন, 'বীরবল সাহেব, পাঁচ বছর আগে মানসিংহের থেকে দশ হাজার মোহর ঋণ নিয়েছিলাম। ১২ শতাংশ সুদে ৫ বছরে সুদ আসে ছয় হাজার মোহর। আপনি রাজ-কোষাগার থেকে মানসিংহকে ১৬,০০০টি মোহর পরিশোধ করে দিন।'

বীরবল হিসেব করে বলল, 'সম্রাট, আপনার হিসাবে একটু সমস্যা আছে। এটি তো চক্রবৃদ্ধি সুদ। এই যে দেখুন চিঠিতে লেখা প্রতি বছর মোট ঋণের উপর ১২ শতাংশ করে সুদ দিতে হবে। ঋণ নেবার পরে তো আপনি কোন সুদ পরিশোধ করেননি। যেহেতু অপরিশোধিত সুদ দেনার সমতুল্য, আপনার মোট দেনা চক্রাকারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সমস্ত দেনার উপর সুদ

যুক্ত হয়েছে। বর্তমানে আপনার দায় হচ্ছে সাড়ে সতেরো হাজার মোহর যা সরল অংকে শতকরা ১৫ শতাংশ সুদের সমান। অর্থাৎ, এই পাঁচ বছরে শতকরা ১৫ শতাংশ সরল সুদে যেই দায় আসতো চক্রবৃদ্ধি হারে শতকরা ১২ শতাংশ সুদে তার সমপরিমাণ দায় আসছে।'

এবার মানসিংহের পুত্র দুর্জন সিংয়ের পালা। সে ছিলো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। ছোট বেলা থেকেই তার স্বপ্ন ছিলো একদিন সে সমগ্র ভারতের রাজা হবে। মাত্র পনেরো বছর বয়সে দুর্জন সিং তার বাবার ব্যবসার দায়ভার গ্রহণ করল এবং ঠিক একই সময়ে সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পরে সম্রাট নিজাম দিল্লির রাজ সিংহাসনে বসলো। নতুন সম্রাট নিজামের ক্ষমতায় বসার টালমাটাল সময়কে সুযোগ বিবেচনায় পাঠানরা ভারতে আক্রমণ করে বসলো। যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করতে সম্রাট হিমশিম খাচ্ছেন এবং রাজ কোষাগার শূন্য হয়ে যাচ্ছে দেখে দুর্জন সিং বন্ধুবেশে সম্রাটের দরবারে হাজির। সুমিষ্ট কণ্ঠে দুর্জন সিং বলল, 'আপনার বাবার বিপদের দিনে আমার বাবা যে সাহায্য করেছিলেন, তা তো আপনি জানেন। এবারের এই বিপদের দিনেও আমি আপনার পাশে আছি।' দুর্জন সিংকে পাশে পেয়ে সম্রাট নিজাম খুব খুশি হলেন। এবারে দুর্জন সিং বলল, 'আমিও আমার বাবার মতন আপনাকে ২০ হাজার মোহর ঋণ দিচ্ছি। সুদের হার চক্রবৃদ্ধিতে ১২ শতাংশ। আপনার এই ঋণ এখন পরিশোধ করার প্রয়োজন নেই। আপনার পুত্রের ক্ষমতা গ্রহণের দিনে তার থেকে আমি আমার পাওনা বুঝে নিয়ে নিব।' নিজাম ভাবলো এই তো সুবর্ণ সুযোগ। যুদ্ধের সময় ঋণ পাওয়াই সৌভাগ্যের ব্যপার। তার উপর এই ঋণ জীবনকালে শোধ না করলেও চলবে। মন্দ কী?

সেবার সম্রাট যুদ্ধে জিতলেন এবং যার ঋণের কল্যাণে এই জয় সম্ভব হয়েছে তাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণে রাখলেন। দুর্জন সিং তাৎক্ষণিকভাবে তার ঋণের টাকা সম্রাটের থেকে ফেরত নিল না। তবে চুক্তি মোতাবেক সম্রাটের পুত্রের থেকে নিবেন বলে জানান। পঞ্চাশ বছর দাপটের সাথে রাজত্ব করে সম্রাট নিজাম একসময় মৃত্যুবরণ করেন। স্বাভাবিকভাবেই, তার পুত্র শাহ্ সুলতান দিল্লির সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হলেন। শাহ্ সুলতানের অভিষেক অনুষ্ঠানের দিন সবার সাথে নিমন্ত্রিত ছিল দুর্জন সিংও। যুবরাজকে মুকুট পরানো হবে ঠিক সেই মুহূর্তে দুর্জন সিং বলে উঠলো, ' রাজকুমার শাহ্ সুলতান, ভারতবর্ষ তো আমার।'

সবাই হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল। দুর্জন সিং এগুলো কি বলছে! সবার অপলক দৃষ্টির সামনে কাগজ বের করে দুর্জন সিং দেখাল 'এই যে দেখুন, সম্রাট নিজাম আমার থেকে ৫০ বছর আগে ১২ শতাংশ সুদে ২০,০০০টি মুদ্রা

ঋণ নিয়েছিলেন। আজকের সভায় তো জ্ঞানী-গুণী অনেক ব্যক্তিই এসেছেন। একটু হিসাব করে বলেন দেখি সম্রাটের বর্তমান দায় কত?'

রাজমনীষী সব কিছু শুনে কাগজ কলম নিয়ে হিসেব করতে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণ হিসেব করে সব কিছু কেটে দিয়ে তিনি আবারো গোড়া থেকে নতুন করে শুরু করলেন। কি যেন একটা সমস্যা হচ্ছে। কয়েক বার গণনা করেও যখন দেখলেন বার বারই বিপুল অঙ্কের একটা মানই আসছে, কম্পিতস্বরে তিনি সবার সামনে ঘোষণা দিলেন, 'সম্রাটের বর্তমান দায় ৫৭ লক্ষ ৮০ হাজার ৪৩টি স্বর্ণমুদ্রা। ৫০ বছরে ১২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদ প্রতি বছর ৫৭৬ শতাংশ সরল সুদের সমান। রাজকোষে এর সিকিভাগ মুদ্রাও নেই। প্রচলিত আইন অনুযায়ী ঋণ অনাদায়ে রাজ্যের মালিকানা দুর্জন সিংয়ের হাতে হস্তান্তরিত হবে। সেই মোতাবেক দুর্জন সিং আজকের সভায় রাজ মুকুট পরানো হোক ।'

> *'Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it ... he who doesn't....pays it.'*
>
> *–Albert Einstein*

> *'চক্রবৃদ্ধি সুদ পৃথিবীর ৮ম আশ্চর্য। আক্কেলমন্তরা এটা আয় করে, আর অগাচণ্ডীরা এটা ব্যয় করে।'*
>
> —আলবার্ট আইনস্টাইন

আইনস্টাইনের দৃষ্টিতে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বস্তু যে সাধারণ মানুষের 'আকল'-এর পরিসীমার বাইরে থাকবে, এটাই স্বাভাবিক! তবে একবার জানা-বোঝার পরেও আমাদের 'আকল' যেন 'বিকল' না হয়, সেই প্রত্যাশাই রইল!

এই ব্যাপারে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যামেরিটাস অধ্যাপক ও বিখ্যাত পদার্থবিদ আলবার্ট এ. বার্টলেট বলেছিলেন :

> *"The greatest shortcoming of the human race is our inability to understand the exponential function."*
>
> *–Albert Allen Bartlett*

> *'এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন (ক্রমবর্ধমান ধারা) বুঝতে না পারাটা মানবজাতির প্রকাণ্ড দুর্বলতা।'*
>
> —আলবার্ট এ. বার্টলেট

গণিত নিয়ে জীবন কাটানো মনীষীদের এই উপলব্ধির গভীরতা ব্যাপক এবং দুঃখজনক সত্য এই যে চক্রবৃদ্ধি সুদের খেলাই ব্যাংকগুলো আমাদের সাথে খেলছে।

চিন্তার খোরাক

- ধরি, জাপান সম্রাট কোতোহিতো ১৬১২ সালে তৎকালীন বাংলার সুবাদার ইসলাম খান চিশতিকে ঢাকার উন্নয়নের জন্য মাত্র ১ শতাংশ সুদে ১ কোটি ইয়েন ঋণ দিলেন। শর্ত হল :

  ১. সুবাদার ও পরবর্তী সব শাসক শুধু সুদ পরিশোধ করতে থাকবেন
  ২. সুদ ও আসলের পরিমাণ প্রতি বছর ঢাকার 'মূল্যস্ফীতি' অনুপাতে সমন্বয় হবে

  তাহলে, বর্তমানে জাপান কত টাকা সুদ পেত আর মূল কত টাকা ঋণ জাপানের পাওনা থাকত?
- ১০০ বছরে ১২ শতাংশ চক্রবৃদ্ধি সুদ বছরে কত শতাংশ সরল সুদের সমান?
- আপনার দেশে ব্যাংকব্যবস্থার সুদের হার কত?
- বর্তমানে প্রতিটা ব্যাংকের হাতে দশ হাজার কোটি করে টাকা থাকলে, চলমান সুদের হারে ১০০ বছর পরে ব্যাংকের হাতে কত টাকা থাকবে?

২. অন্য ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে কী হত?

রূপসাগরের মহাজন রাজা মিয়া সব সুদ ঋণে না খাটিয়ে ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে কি ভারসাম্য বজায় থাকত?

উত্তর হচ্ছে 'হ্যাঁ', সেক্ষেত্রে মুদ্রার ভারসাম্য বজায় থাকত। কারণ, ব্যবসায় বিনিয়োগ করার ফলে সুদের কড়ির মালিকানা পরিবর্তিত হতো এবং সিন্দুকের সকল কড়ি মানুষের হাতে হাতে পৌঁছে যেত। এভাবে, সুদ থাকা সত্ত্বেও ভারসাম্য বিঘ্নিত হতো না। এমনকি প্রতি বছর ভেসে আসা কড়ির পরিমাণ অপেক্ষা সুদের পরিমাণ বেশি হলেও ভারসাম্য রক্ষা পেত।

সাগরে ভেসে আসা কড়ির পরিমাণ ১০০ এবং মহাজনের বার্ষিক সুদ ১২০ কড়ি হলে, কীভাবে ভারসাম্য থাকবে— তা হয়তো আপনাকে ভাবিয়ে তুলছে। ধরুন যে, দ্বীপে আপনার একটি বাড়ি আছে এবং প্রতি বছর বাড়ির

ভাড়া বাবদ ১২০ কড়ি পাচ্ছেন। এই ভাড়ার পুরোটাই আবার ব্যবসায় খাটাচ্ছেন। ঠিক তেমনি করে রাজাও সুদের কারবার থেকে প্রাপ্ত ১২০ কড়ির সমস্তটাই বিনিয়োগ করছে। কোন তফাৎ দেখতে পাচ্ছেন কি? না, কোন তারতম্য দেখা যাচ্ছে না। ঠিক এই কারণেই উভয় ক্ষেত্রে একই কৌশলে ভারসাম্য বজায় থাকত।

তবে সুদ ও ব্যবসা একত্রে পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি ঝামেলা হতো। কোন কারণে ব্যবসায় মুনাফার পরিমাণ কমে গেলে, মহাজন স্বয়ংক্রিয়ভাবেই সুদকে প্রাধান্য দিয়ে সুদি ব্যবস্থায় ফিরে যেত। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, যেখানে ঋণ ব্যবসা করে সব কড়ি অর্জন করা সম্ভব, সেখানে সম্পূর্ণ আয় ব্যবসায় বিনিয়োগ করা ভুল সিদ্ধান্তও বটে। তাই এই সাম্যাবস্থাটি অবাস্তব।

একারণেই কেউ সুদ ছেড়ে ব্যবসা শুরু করে দিয়েছে, সেরকম উদাহরণ কোথাও মেলে না। বরং একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী এক পর্যায়ে সুদি প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করে পাক্কা সুদখোর হয়ে গেছেন, এমনটাই দেখি।

৩. সব সুদ নিজের ব্যয়ভার মেটাতে খরচ করে ফেললে কী ঘটত?

সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা যাক। একজন সুদি মহাজন সব সুদ তার নিজের ও নিজ পরিবারের পেছনে ব্যয় করে ফেললে এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি না করলে মুদ্রার ভারসাম্য বজায় থাকত কি? উত্তর হচ্ছে, হাঁ থাকত। কারণ এক্ষেত্রে সুদের আয়ের সব কড়িই সমাজে ফেরত যেত, ঋণ বৃদ্ধি পেত না এবং কড়ির মালিকানা পরিবর্তিত হতে থাকত।

তবে, এই সাম্যাবস্থাটা বেশ নাজুক। ঋণ সামান্য পরিমাণে 'একবার' বৃদ্ধি পেলেই তা চক্রবৃদ্ধিতে ফুলে ফেঁপে উপরে দেখানো একইরকম বিপর্যয়কর ফলাফলে পৌঁছে যেত।

সম্পদ অর্জনের এই গুপ্ত রহস্যটা আমাদের জানা জরুরি যে, সব মুদ্রা একজন ব্যক্তির হাতে আসা এবং সব সম্পদ একজন ব্যক্তির হাতে জমা হওয়াটা একই কথা না। মুদ্রা একহাতে কুক্ষিগত হওয়ার পরও সবার জমি, বাগান-পুকুর ও বাড়ি তথা স্থাবর সম্পদরাজি সব আগের মতই যার যার দখলে থাকত। তবে সুদি মহাজন তার পছন্দের ব্যক্তিদের মুদ্রা (ঋণ) দিয়ে নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে, আবার তার শত্রুদের মুদ্রাহীন (ঋণবঞ্চিত) করে শাস্তিও দিতে পারে। এভাবে সুদ একটি রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য তৈরি

করার পাশাপাশি সুদি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছায়া স্বৈরাচারতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

উদাহরণস্বরূপ আমাদের গল্পে রাজা নামক সুদি মহাজনের হাতে সব মুদ্রা কেন্দ্রীভূত হলে পরে রাজা তার পছন্দের ব্যক্তিকে ক্ষমতায় আনতে পারে, আবার ঋণবঞ্চিত করে তার অপছন্দের ব্যক্তিকে টালমাটাল অবস্থায়ও ফেলে দিতে পারে। এমনকি কোন জনপ্রিয় শাসক মহাজনের বিরুদ্ধে অবস্থান নিলে, ঋণ ব্যবসায়ী মোট ঋণ সরবরাহ (বা মুদ্রা প্রবাহ) কমিয়ে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনও গড়ে তুলতে পারে!

'I am afraid that the ordinary citizen will not like to be told that the banks can and do create and destroy money. And they who control the credit of a nation direct the policy of governments, and hold in the hollow of their hands the destiny of the people.'

–Reginald McKenna British Banker & Politician

'বুঝতে পারলে জনতা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হবে যে, ব্যাংক নিজেই টাকা তৈরি করতে পারে, টাকা তৈরি করে এবং মর্জিমাফিক সেই টাকা ধ্বংসও করে। আর দেশের অর্থের জোগান নিয়ন্ত্রণকারীরাই মূলত সরকারের সকল নীতি নির্ধারণ করে এবং জাতির ভাগ্যলিপি তাদের হাতের মুঠোতেই জমা।'

—রেজিনাল্ড ম্যাককেনা ব্রিটিশ ব্যাংকার ও রাজনীতিবিদ

পৃথিবী বিখ্যাত রথসচাইল্ড পরিবারের নাম শুনেছেন? তাদেরকে কেন দুনিয়ার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী পরিবার হিসেবে বিবেচনা করা হয়? সেই পরিবারের একজনের কাছ থেকেই শুনে নিন...

'I care not what puppet is placed upon the throne of England to rule the Empire on which the sun never sets. The man who controls Britain's money supply controls the British Empire, and I control the British money supply.'

–Nathan Mayer Rothschild
English-German Banker, Businessman and Financier (1777-1836)

'সূর্যাস্তবিহীন সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসনে কে বসল, তা নিয়ে আমি চিন্তিত না। কারণ ব্রিটেনের মুদ্রা সরবরাহ ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণকারীই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রকৃত ক্ষমতার মালিক। আর ব্রিটেনের মুদ্রাব্যবস্থা আমারই নিয়ন্ত্রণে।'

— নাথান মেয়ার রথসচাইল্ড
ইংরেজ-জার্মান ব্যাংকার, ব্যবসায়ী ও ফাইন্যান্সিয়ার (১৭৭৭-১৮৩৬)

নাথান রথসচাইল্ডের বক্তব্যের মূলসুরে বিপুল টাকার মালিককে বোঝানো হয়নি। বরং এখানে অর্থ সরবরাহ নিয়ন্ত্রণকারীর (control of money supply) কথা নির্দেশ করা হচ্ছে, প্রকৃত অর্থে যিনি একটি রাষ্ট্রের মূল ক্ষমতাকেন্দ্রের মালিক। এই ক্ষমতাটাই পুঞ্জীভূত হয় সুদি মহাজন বা ব্যাংকগুলোর হাতে। বিষয়টি এমন দাঁড়ায় যে— মহাজন ঋণ নবায়ন না করলে (বাজার থেকে টাকা তুলে নিলে) টাকার সংকট সৃষ্টি হয়। বিপরীতে, স্বাভাবিক নিয়মে ও গতিতে ঋণ দিলে টাকা পুনরায় বাজারে প্রবেশ করে এবং মুদ্রা সংকট কেটে যায়। এভাবে একজন সুদ কারবারি বা ব্যাংকব্যবস্থা নিমিষেই মুদ্রা সংকট সৃষ্টি ও নিরসন করতে পারে।

> *'The money powers prey upon the nation in times of peace and conspire against it in times of adversity. It is more despotic than a monarchy, more insolent than autocracy, and more selfish than bureaucracy. It denounces as public enemies, all who question its methods or throw light upon its crimes'*
>
> –Abraham Lincoln 16th American President

> *'মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাধারীরা সুসময়ে জাতিকে শোষণ করে আর দুঃসময়ে জাতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ঘোঁট পাকায়। এটা রাজতন্ত্রের চেয়েও স্বৈরাচারী, ঔদ্ধত্যের দিক দিয়ে একনায়কতন্ত্রেরও সরেস এবং স্বার্থপরতায় আমলাতন্ত্রকে ডিঙিয়ে যায়। এদের কর্মপদ্ধতি ও অপরাধের মুখোশ উন্মোচনকারীকে তারা জাতীয় শত্রু হিসেবে উপস্থাপন করে।'*
>
> — আব্রাহাম লিংকন ১৬তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি

অর্থনীতি

যেকোন অর্থনীতিতে মোট মুদ্রার পরিমাণ কমে গেলে কী হয়? ইতোমধ্যেই আমরা জানি যে, তখন সমান তালে পণ্যমূল্য, মানুষের আয় এবং ব্যয় কমে যায়। অর্থনীতির পরিভাষায় এটাই মূল্যহ্রাস বা ডিফ্লেশন। মূল্যহ্রাসের কারণে সংখ্যাগত দিক বিবেচনায় সবকিছু পরিবর্তিত হয়ে গেলেও ভোক্তার অর্থনৈতিক অবস্থা তথা জীবনযাপনের মান 'প্রায়' আগের মতই থাকে। কারণ মোট মুদ্রার পরিমাণ এবং মোট উৎপাদনের মাঝে স্থায়ী কোন সম্পর্ক নেই। মুদ্রা সংকট তাই দীর্ঘ মেয়াদে একটা অনুল্লেখযোগ্য বিপত্তি বৈ কিছু নয়। নতুন আঙ্গিকে সবক্ষেত্রে সামঞ্জস্য চলে আসে। বিষয়টি ভালো ভাবে বোঝার জন্য একটি প্রশ্ন করি;

দেশে টাকার পরিমাণ কমে গেলে কি সেই দেশের খাদ্যশস্য পচে যায়? শিল্প প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়? ঘরবাড়ি মাটির সাথে মিশে যায়? কিংবা কোন ব্যক্তি উধাও হয়ে যায়?

না, টাকার অনুপস্থিতিতে এরকম কোন বস্তুগত ক্ষতিসাধিত হয় না। বরং, সবকিছু আগের মতোই থাকে। যেই জিনিস (টাকা) কোন কিছু ধ্বংস বা সৃষ্টি করতে পারলো না, তার বৃদ্ধি বা হ্রাসে কি কিছু আসে যায়?

ঠিক বলেছেন, বিশেষ কোনকিছুই আসে যায় না। ধরুন, পশ্চিমবঙ্গের নাগরিক রবীন্দ্রের বর্তমান আয় মাসে ১ লাখ টাকা, ব্যয় ৮০ হাজার টাকা এবং পৈতৃক সম্পত্তির মূল্য ১ কোটি টাকা। একদিন দূর দেশ থেকে একদল শত্রু এসে সবার অর্ধেক টাকা ডাকাতি করে নিয়ে গেল। এতে দেশের মোট টাকার পরিমাণ কমে অর্ধেক হয়ে বাজারে মুদ্রা সংকট শুরু হয়ে গেল। কিছুদিন পরে দেখা যাবে সবার আয় এবং ব্যয়ও কমে অর্ধেক হয়েছে। রবীন্দ্র হিসাব করে দেখবে তার আয় আগে ১ লাখ টাকা থাকলেও এখন হয়েছে ৫০ হাজার টাকা, আবার একই সময়ে ব্যয় ৮০ হাজার থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪০ হাজারে এবং সম্পত্তির মূল্য কমে হয়ে গেছে ৫০ লাখ টাকা। এমন ঘটনা কেবল রবীন্দ্রের সাথেই নয়, দেশের সবার সাথেই সমান ভাবে ঘটবে। তবে, এই রাহাজানির প্রভাবে দেশের মোট খাদ্যের উৎপাদন কমবে না, কেউ অপুষ্টিতে ভুগবে না, শিল্প কারখানা বন্ধ হবে না, এমনকি কেউ দারিদ্র্যেও ভুগবে না। এক কথায়, এতে কারো সম্পদ হারাবেও না, বাড়বেও না। শুধু কিছু সংখ্যাগত পরিবর্তন ঘটবে এবং বাদবাকি সবকিছু আগের মতই থাকবে।

এই চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হয় যখন একটি দেশের জনগণ ঋণগ্রস্ত থাকে। মুদ্রা সংকট শুরু হবার পূর্বে যেসকল ব্যক্তি ঋণ নিয়েছিল, বিপদকালে তাদের হাতে মুদ্রার পরিমাণ কমে গেলে তারা ঋণ বা সুদ কোনোটাই পরিশোধ করতে পারবে না। উপরের উদাহরণে রবীন্দ্রের কথাই চিন্তা করুন, সে বিগত বছরে তার পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক রেখে ৬৫ লাখ টাকার ঋণ নিয়ে থাকলে, বর্তমানে তার কী সঙ্গীন অবস্থাটাই না হতো? মুদ্রা হ্রাস শুরুর পরে তার পৈতৃক সম্পত্তির মূল্য কমে ৫০ লাখ টাকা হয়ে যেত। অর্থাৎ, মোট দায় মোট সম্পত্তির চেয়ে বেশি হয়ে যেত। এক্ষেত্রে, রবীন্দ্র দেউলিয়া হয়ে ভিটে মাটি হারাতো।

ভিন্নভাবে ঐ ঘটনাটি বিবেচনা করে দেখুন— মনে করি, রবীন্দ্রের নেওয়া ৪০ লাখ টাকা ঋণের বিপরীতে তাকে প্রতি মাসে সুদ গুণতে হচ্ছিল ২০ হাজার টাকা। পূর্বে মাসে ৮০ হাজার টাকা ব্যয়বাবদ রেখে বাকি ২০ হাজার টাকা সে সুদ প্রদান করতো। বর্তমানে আয় কমে হয়ে গছে ৫০ হাজার টাকা

যা থেকে ৪০ হাজার টাকা ব্যয় করার পরে, তার হাতে থাকে মাত্র ১০ হাজার টাকা। এবারও সে দেউলিয়া হয়ে যাবে। কারণ হচ্ছে ডিফ্লেশনের সময় অন্য সব কিছুর মূল্যহ্রাস হলেও ঋণ এবং সুদের দায় এর বেলায় পূর্বের সংখ্যাগুলোই বহাল থাকে। তাই একটি ঋণগ্রস্ত সমাজে মুদ্রাহ্রাস শুরু হলে দেউলিয়া ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে যায়। তাই কলকারখানা বন্ধ হয়, শ্রমিকরা চাকরি হারায়, দরিদ্রশ্রেণি অপুষ্টিতে ভোগে, আত্মহত্যা করে এবং দেশের মোট উৎপাদন হ্রাস পায়। এক কথায় ঋণগ্রস্ত জাতিকে মুদ্রা সংকটের চরম মূল্য দিতে হয়, যা আন্দোলন এবং অসন্তোষ সৃষ্টির নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

ব্যাংকাররা এই পরিস্থিতি তৈরি করলে তাদের থেকেই আবার ঋণ নেওয়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কারণ, ব্যাংক মুদ্রা কুক্ষিগত করলে যেমন মুদ্রা সংকট তৈরি হয়, ঠিক তেমনি ঋণ দিলে মুদ্রা সিন্দুকের গণ্ডি পেরিয়ে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। এভাবে সমাজের সবার হাতে হাতে মুদ্রা পৌঁছে যায় এবং দেউলিয়া হবার হুমকি থেকে মুক্তি পায়। তাই কল-কারখানা সচল থাকে, শ্রমিকরা কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনৈতিকভাবে চাঙ্গা থাকে। এভাবে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঋণ নবায়নের প্রক্রিয়া চলে। তাই ব্যাংকের কাছে সবাই নিরুপায় ও অসহায়। এমনকি একজন রাষ্ট্রপ্রধানও ব্যাংকের বিরুদ্ধে যান না, অতিসাবধানী আচরণ করেন।

এগুলো নীতিনির্ধারকদের সবার জানা বিষয়, অথচ সাধারণ জনতা এই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে পাত্তাই দেয় না। নিচে এক শতাব্দী আগের একজন মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও আইনজ্ঞের উক্তিটি পড়ুন :

'They know in advance when to create panic to their advantage. They also know when to stop panic. Inflation and deflation work equally well for them when they control finance'

-Charles A. Lindbergh
US Congressman & Lawyer (1859-1924)

'উপযুক্ত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে সংকট সৃষ্টি ও নিরসনের যথাযথ মুহূর্তটি আগেভাগেই তারা চিহ্নিত করে। তাদের স্বার্থ উদ্ধারে মূল্যস্ফীতি এবং মূল্যহ্রাস দুটোই সমানভাবে কাজ করে। কারণ, তারাই অর্থনীতির প্রকৃত নিয়ন্ত্রক।'

— চার্লস এ. লিন্ডবার্গ
মার্কিন কংগ্রেসম্যান ও আইনজ্ঞ (১৮৫৯ - ১৯২৪)

'This is a staggering thought. We are completely dependent on the commercial Banks.'

–Robert H Hemphill
Credit Manager of Federal Reserve Bank of Atlanta, 1934

'কি ভয়ংকর ব্যাপার! আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকের উপর পুরাদস্তুরভাবে নির্ভরশীল!'

—রবার্ট এইচ হেম্ফিল
ক্রেডিট ম্যানেজার, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আটলান্টা (১৯৩৪)

'Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws!'

–Mayer Anselm Rothschild
Founder of the Rothschild banking dynasty & founding father of international finance (1744-1812)

'কোন জাতির টাকা তৈরি এবং সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগটা কেবল আমাকে দাও, আইন কার হাতে সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপেরও সময় নেই।'

—এম. অ্যানসেল্ম রথসচাইল্ড
রথসচাইল্ড ব্যাংকিং যুগ এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্সের জনক (১৭৪৪ - ১৮১২)

একটি রাজ্যের মুদ্রা স্বর্ণ বা কড়ি বা কাগজ যাই হোক না কেন, সুদের লেনদেনযোগ্য কারেন্সিটা টিকিয়ে রাখাই কারবারিদের লক্ষ্য এবং এর মাঝেই তার ক্ষমতা নিহিত। সুদের মুদ্রাই তাদের ক্ষমতার হাতিয়ার। মুদ্রাগুলো সিন্দুকে অকেজো পড়ে থাকলে তা ক্ষমতার কলকাঠি অকেজো হওয়ার শামিল। আর প্রচলিত মুদ্রা ত্যাগ করে সবাই যদি রাতারাতি অন্য কিছু দিয়ে লেনদেন শুরু করে তা হবে মহাজনদের ক্ষমতার শোচনীয় পরাজয়। তাই আইন প্রণয়ন করে প্রচলিত মুদ্রাকে একমাত্র লিগাল টেন্ডার হিসেবে ঘোষণা করা এবং বাদবাকি সব মুদ্রাব্যবস্থাকে নিষিদ্ধ করা, তাদের ক্ষমতাকে সিলগালা করার অপর নাম।

চতুর্থ অধ্যায়
ব্যবসা কাঠামোর গভীর বিশ্লেষণ

ব্যবসার গভীর বিশ্লেষণের পূর্বে একটি বিষয় সুস্পষ্ট করার দাবি রাখে। ব্যবসায় দুর্নীতি, প্রতারণা, গুদামজাতকরণ এবং উৎকোচ প্রদানসহ ইত্যকার অসাধু কার্যকলাপ জড়িত থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই নেতিবাচক উপকরণগুলো সুদের সাথেও জড়িত থাকতে পারে। যেমন— একজন ব্যাংকার (বা সুদ কারবারি) কাউকে ঘুষ দিতে পারে, মানুষের সাথে মিথ্যা কথা বলতে পারে, চাঁদাবাজি করতে পারে। এমন হাজারটা অসাধু উপায় আছে, তাই তো? সেগুলো আমরা আমাদের আলোচনায় আনছি না কেন? আনছি না এজন্য যে, কাঠামোগত বিশ্লেষণই আমাদের উদ্দেশ্য। মানব চরিত্র কিংবা আইনের ফাঁকফোকর নিয়ে আলোচনা শুরু করলে সেই লক্ষ্য ব্যাহত হবে।

উদাহরণস্বরূপ, সুদ সবার জন্য উপকারি হলে এবং অসাধু মহাজন কর্তৃক সুদচর্চার কারণেই কেবল এর উপকার থেকে সমাজ বঞ্চিত হলে, আমরা সুদকে খারাপ বলতে পারতাম না। বরং আমরা ঐ সকল ব্যক্তিকেই দোষারোপ করতাম, যাদের কারণে একটি ভালো জিনিস খারাপ হয়ে গেল। ঠিক তেমনি করে দুর্নীতি, চুরি, প্রতারণার দ্বারা যদি ব্যবসা কাঠামোর সুফল নষ্ট হয়ে যায়, তার জন্য আমরা ব্যবসাকে দায়ী করতে পারি না।

এসকল কারণে কাঠামোগত বিশ্লেষণে প্রাথমিক ধর্তব্য হলো, সমাজের সকল প্রচলিত আইনের মধ্যে থেকে এই ব্যবস্থাটি কাজ করবে। এজন্য উপরের আলোচনায় আমরা রিবা কিংবা রাজাকে কোন আইন ভঙ্গ করতে, মিথ্যা বলতে বা দুর্নীতি করতে দেখিনি। ঠিক একই কারণে আমাদের ব্যবসায়ীদেরকেও একচেটিয়াকরণ, গুদামজাতকরণ এবং ভোক্তা অধিকার বিনষ্টকরণে অংশগ্রহণ করতে দেখব না। এই কৌশল অবলম্বন করলে আমরা খুব স্বচ্ছভাবে সমাজ এবং অর্থনীতিতে এই দুই কাঠামোর নিরেট প্রভাব দেখতে এবং এদের মাঝে তুলনা করতে পারবো।

যাই হোক, আমরা ইতোমধ্যেই পর্যালোচনায় দেখেছি যে ব্যবসা করে সকল মুদ্রা কুক্ষিগত করা অসম্ভব হলেও সুদের দ্বারা সম্ভব। সেই হিসেবে ব্যাপারটা কি এমন দাঁড়াচ্ছে যে 'সুদ মুদ্রাকেন্দ্রিক বিধায় সুদ কারবারি সব মুদ্রা নিজ হস্তগত করতে পারবেন।' এবং 'ব্যবসা সম্পদকেন্দ্রিক হওয়ায় একজন ব্যবসায়ী সব 'সম্পদ' হস্তগত করতে পারবেন?'

ঐতিহাসিকভাবেই এই প্রশ্নটির উত্তরও হচ্ছে, 'না'। তবে তাত্ত্বিক ভাবে এর উত্তর না প্রমাণ করা যায় কি? মূলত চারটি কারণে ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ায় তাত্ত্বিক ভাবেই সকল সম্পদ হস্তগত করা সম্ভব না।

প্রথম কারণ— ব্যবসার প্রসার বা সুযোগের সীমা থাকা

পরিসর সীমিত হওয়ায় প্রতিটি ব্যবসা বৃদ্ধিরই সর্বোচ্চ সীমা আছে। সেই ঊর্ধ্বসীমায় পৌঁছে ব্যবসা তার প্রবৃদ্ধির সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে।

উদাহরণস্বরূপ, পলাশ তাদের বাসার গলির মুখে একটা মুদি দোকান দিল। গলিতে মোট ৩০টি পরিবার বসবাস করলে এবং তাদের সবাই পলাশের কাছ থেকে মুদি পণ্য কিনলে দোকানের বিক্রি এই পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। পরবর্তীকালে ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি আনতে চাইলে তাকে নতুন কোন গলির মুখে দোকান খুলতে হবে। কিন্তু দেখা যাবে অন্য গলিতে আগের থেকেই একটি দোকান আছে এবং ঐ এলাকাবাসী সেই দোকান থেকেই কেনাকাটা করতে অভ্যস্ত। তাই ব্যবসা প্রসার করতে গেলে পলাশ একটি গণ্ডিবদ্ধতা অনুভব করবে।

দ্বিতীয় কারণ— সীমিত সম্পদের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি

একজন ব্যক্তি যত বেশি সম্পদ কুক্ষিগত করেন, বাদবাকি সব সম্পত্তির মূল্য তত বেশি বৃদ্ধি পায়। তাই ক্রমাগত কিনে কিনে সব সম্পত্তি অর্জন করার স্বপ্ন খুব দ্রুত ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যায়।

যেমন : ২০ বছর আগে আমেরিকার কৃষি জমির একর প্রতি দাম ছিল প্রায় এক/দেড় হাজার ডলার। মাইক্রোসফটের মালিক বিল গেটস নামে-বেনামে জমি কিনতে কিনতে এখন বেসরকারি বা সিভিলিয়ান হিসেবে আমেরিকার সর্বোচ্চ কৃষি জমির মালিক। তাঁর দেখাদেখি আরো অনেক ধনকুবের এই কাজ করেছেন এবং এর ফলশ্রুতিতে কৃষি জমির দাম এখন

একর প্রতি ৩ হাজার ডলারেরও বেশি। সুতরাং, নতুন করে আগের সমপরিমাণ জমি কিনতে দ্বিগুণেরও বেশি খরচ করতে হচ্ছে, যেটা কার্যত তাদের নতুন সম্পদ অর্জনের পথটিকে কঠিন করে তুলছে।

তৃতীয় কারণ— নির্ভরশীলতা

প্রতিটি ব্যবসায়ীকেই অপরাপর প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন করতে হয় এবং এই লেনদেনের ফলে উভয়পক্ষের সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

যেমন : পাঠাও আজকে চমৎকার একটা রাইড শেয়ারিং সার্ভিস। পাঠাও ব্যবসা করে মিলিয়ন ডলার অর্জন করছে এবং ক্রমাগত অন্যান্য সার্ভিসে বিনিয়োগ করছে। পাঠাও এর সাথে সাথে চালকরাও মোটরসাইকেল ও গাড়ি কিনছে। এই যে ওয়ালটনের মোটরসাইকেল আর জাপানের টয়োটার বেশি বিক্রি হচ্ছে, সেই কোম্পানির লোকজন বেশি আয় করছেন, জমি কিনছে ইত্যাদি। এভাবে একজনের সাফল্যের কারণে অপরাপর ব্যবসায়ীক পার্টনাররা উপকৃত হচ্ছে ও নতুন সম্পদের মালিক হচ্ছে।

চতুর্থ কারণ— দক্ষতার সীমা

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সব কাজে সমভাবে পারদর্শী হতে পারে না। এক একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এক একটি কাজে দক্ষ হয়ে থাকেন।

উদাহরণস্বরূপ, কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইটি খাতে বিশেষজ্ঞ হলে তা নিশ্চয়ই তারা একই সাথে শল্য চিকিৎসা, কৃষিকাজ কিংবা তৈরিপোশাক খাতে সমানভাবে পারদর্শী হতে পারবে না। সবাই সব কাজ একইরকম দক্ষতার সাথে করতে পারে না। তাই এক একটি খাতে এক একটি কোম্পানি (বা ব্যক্তি) নেতৃত্বস্থানে থাকে।

নয়নতারার ব্যবসা

পুরো প্রক্রিয়াটা আরেকটু বিস্তারিত বুঝতে চিন্তার জাহাজ রূপসাগরে ভাসানো যাক।

পিতার ভুল সিদ্ধান্ত থেকে বুলবুল সাহেবের কন্যা 'নয়নতারা' পরিষ্কারভাবে বুঝেছে, 'ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে বিনিয়োগের কোন বিকল্প

নেই।' বুলবুল সাহেবের মৃত্যুর পরে সেই মোহর ভর্তি সিন্দুক এবং সাগর পাড়ের বাড়িটি উত্তরাধিকারসূত্রে নয়নতারার দখলে এসেছে। সিন্দুক খুলতেই নয়নতারা এর ভেতর ১০০টি মোহর সঞ্চিত পেল। এই পুঁজি চাইলে সে সুদে অথবা ব্যবসায় ইচ্ছামাফিক খাটাতে পারে।

ধরা যাক, রূপসাগরে মাছের ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক। এই ব্যবসায় গড় রিটার্ন ২০ শতাংশ (১০০টি মুদ্রা বিনিয়োগ করলে বছরে লাভ আসে ২০টি মুদ্রা)। অপরপক্ষে, দ্বীপে সুদের হার মাত্র ১০ শতাংশ (১০০টি মুদ্রা বিনিয়োগে বছরে লাভ আসে ১০টি মুদ্রা)। তাই নয়নতারা, সুদে টাকা না খাটিয়ে, খুব ঘটা করে কিছুসংখ্যক নৌকা কিনে মাছের ব্যবসায় নেমে পড়ল। সবকিছু ঠিক থাকলে মাত্র পাঁচ বছরে সে আয় করবে ১০০টি মুদ্রা। অতঃপর সে পুনরায় বিনিয়োগ করে নৌকার সংখ্যা দ্বিগুণ করা সাপেক্ষে পরের পাঁচ বছরে আয় করবে আরো ২০০টি মুদ্রা, তৎপরবর্তী পাঁচ বছরে সে আয় করবে ৪০০টি মুদ্রা এবং শেষ পাঁচ বছরে ৮০০টি মুদ্রা... এভাবে চক্রাকারে তার আয় বৃদ্ধি পেতেই থাকবে। এমন হওয়াটা কি সম্ভব?

উত্তর হচ্ছে, অসম্ভব। মাছের সরবরাহ বৃদ্ধি পেলেই বাজারে মাছের দাম পড়ে যাবে। তাই নয়নতারার লাভও ক্রমাগত কমে আসবে। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো রূপসাগরে ক্রেতার সংখ্যা সীমিত। শুধু রূপসাগর নয়, পৃথিবীর প্রতিটি জাতিতেই ক্রেতার সংখ্যা সীমিত। তাই বিশ্বের কোথাও বিক্রির পরিমাণ অনন্তকাল বৃদ্ধি করা সম্ভব না। একটি সীমার পরে ক্রেতাই খুঁজে পাওয়া যাবে না। ক্রেতার সংখ্যা এবং একজন ক্রেতা কোন পণ্য (যেমন মাছ) কতো বেশি ভোগ করতে পারবে, তার ঊর্ধ্বসীমা আছে। একারণে সব ব্যবসা বৃদ্ধিরই একটি গণ্ডি আছে।

সরবরাহের দিকে নজর দিলেও আমরা এই চিত্র দেখতে পাই। কোন জলাধারে মাছের সরবরাহ সীমিত। তাই নৌকার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকলেই তার সাথে সাথে শিকারের সংখ্যা সমানতালে বৃদ্ধি পাবে না। এভাবে নৌকা অনুপাতে মাছ ধরা পড়বে কম, তাই উৎপাদন খরচ বেড়ে যাবে।

চৌকশ ব্যবসায়ী নয়নতারা বিষয়গুলো বুঝতে পেরে আর মাছের দিকে না ঝুঁকে, কিছু সংখ্যক গবাদি পশু ক্রয় করে পশুপালনে নেমে পড়লো। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এই ব্যবসাতেও একটি নির্দিষ্ট চৌহদ্দির পরে আর আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব হলো না। কারণগুলো এরূপ :

প্রথমত : রূপসাগরে দুধ এবং মাংসের ক্রেতা সীমিত।

দ্বিতীয়ত : কোন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে কিন্তু বাকি সব নির্ধারকগুলো আগের মত থাকলে এর বাজারমূল্য কমে যাবে। অর্থাৎ, রূপসাগরে দুধ এবং মাংসের বাজার মূল্য কমে যাবে।

তৃতীয়ত : চারণভূমির সম্প্রসারণও নয়নতারার ইচ্ছাধীন নয়। দ্বীপে মোট চারণভূমির পরিমাণ সীমিত। তাই পশুর সংখ্যাও হবে সীমিত।

চতুর্থত : নয়নতারা একা একই সাথে মাছ ধরা এবং গবাদি পশুপালন করার কাজ করতে পারবে না, তাকে নতুন কর্মী নিয়োগ করতে হবে। এভাবে ব্যবসার খরচ বৃদ্ধি পাবে এবং লাভ কমে যাবে।

সব মিলিয়ে নয়নতারা এযাত্রায়ও ফেঁসে যাবে। বহুমুখী চেষ্টা সত্ত্বেও মোট সম্পদের পরিমাণ সামনের দিকে দ্রুত টেনে নিতে পারবে না।

নয়নতারা একের পর এক বাড়ি নির্মাণ করে ভাড়া দিলেও, একটি পর্যায়ের পরে বাড়ি খালি পড়ে থাকত, কারণ ভাড়া থাকার মতো এত মানুষ দ্বীপে নেই!

রূপসাগরের মতো পৃথিবীর সর্বত্র ব্যবসায় এরকম সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। এমনকি যেসকল ব্যবসা সম্পূর্ণ আন্তর্জাতিক, সেগুলোও পৃথিবী নামক গ্রহের গণ্ডিতে আবদ্ধ। এই চৌহদ্দির নির্দিষ্টতা অপসারণের লক্ষে ব্যবসায়ীরা নতুন বাজারে প্রবেশ এবং ব্যবসা বহুমুখীকরণ করে থাকে। তাই লাভের ধারা বজায় রাখতে রূপসাগরের নয়নতারাকেও প্রতিনিয়ত নতুন নতুন খাতে বিনিয়োগ করে ব্যবসা সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখতে হবে। এভাবে নয়া নয়া উদ্যোগ নেওয়ার সাথে মুক্ত প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকার সংগ্রামও চলতে থাকবে।

ধরা যাক, নয়নতারা পরিকল্পনা করল সাগর পাড়ের বাড়িটি আরো সম্প্রসারণ করে নতুন কাউকে ভাড়া দিবে। সেই বাড়ির পাশের জমিনের মালিক বকুল নামে একজন দরিদ্র চাষি। নয়নতারা বকুলকে বলল, 'আপনার জায়গাটি বিক্রি করলে এর বিনিময়ে আমি দশটি সোনার মোহর দিব।'

বকুল একটু সময় চেয়ে বলল, 'চিন্তা করে দেখি।'

কিছুদিন যেতে না যেতেই এলাকার ধনাঢ্য বিধবা এবং সফল উদ্যোক্তা জুঁই ভাবী এসে হাজির। তিনি বকুলকে বললেন, 'আমি তো এখানে একটি

পশুর খামারের পরিকল্পনা করেছিলাম। শুনেছি নয়নতারা এই জমির দাম দশ মোহর বলে গেছে। আমি আপনাকে এগারো মোহর দিলে জমিটি আমার কাছে বিক্রি করবেন?' বকুল সব শুনে বললো, 'আগে নয়নতারা বুবুর সাথে কথা বলে দেখি, উনি দাম বাড়াতে কিনতে রাজি হন কিনা।'

নয়নতারার সাথে পুনর্বার আলাপ করে বকুল এবার বারোটি মোহরের বিনিময়ে জায়গাটি বিক্রি করে দিল।

লক্ষ্য করুন, বকুল একজন সাধারণ চাষি। সে কোন দিন ব্যবসা করেনি এবং করবেও না। দ্বীপে যে নতুন নৌকা তৈরি হলো, খামার তৈরি হলো, বাড়ি নির্মাণ করা হলো তার কোন কিছুর সাথেই সে জড়িত ছিলো না এবং নাইও। তারপরেও তার সম্পদের দাম বেড়ে গেলো। এভাবে সীমিত সম্পদ হস্তগত করার জন্য ব্যবসায়ীরা একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে থাকে এবং ব্যবসার সুস্থ প্রতিযোগিতায় সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। তখন ব্যবসা বহির্ভূত ব্যক্তিরাও সম্পদশালী হতে থাকে। কেবল বকুল একা নয়, তার প্রতিবেশী মাধবী, শিমুল, শাপলাসহ এলাকার সবাই এই প্রক্রিয়ায় সম্পদশালী হয়ে যাবে। কারণ, এখন থেকে সবার ঐ পরিমাণ জমির দাম ১২ মুদ্রা বলেই বিবেচ্য হবে। শুধু জমি নয়, অন্যান্য সম্পদ যেমন-ঘর-বাড়ি, বাগান, গাছ সব কিছুরই ব্যবসা প্রতিযোগিতা দ্বারা মূল্যমান বৃদ্ধি পায়। এভাবেই একজন ব্যক্তি যতো বেশি সম্পদ কুক্ষিগত করতে চাইবেন, বাদবাকি সব সম্পত্তির মূল্য ততো বেশি বৃদ্ধি পায়। তাই সীমিত সম্পদের পৃথিবীতে কেনার মাধ্যমে কব্জা করে কখনও সব সম্পদ কুক্ষিগত করা সম্ভব নয়।

আরেকটি বিষয় হলো, নয়নতারা চাইলেও সব ব্যবসা করতে পারবে না। নয়নতারা রূপসাগরের প্রসিদ্ধ তাঁতি টগরকে তাঁত ব্যবসায় টক্কর দিতে চাইলেও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হত না (বিশেষ প্রযুক্তি ব্যতীত)। টগর সবার কাপড় বুনছে মানে, এই কাজে সে সবার চেয়ে দক্ষ। কেবল মাত্র টাকা থাকলেই এই ব্যবসা হস্তগত করা যাবে না।

তারপরেও ধরে নেই, সব সম্পদ অর্জনের লোভ সামলাতে না পেরে নয়নতারা এই ব্যবসাতেও হস্তক্ষেপ করবে বলে ঠিক করল। টগর ব্যাটা মহাচতুর। সুযোগ বুঝে তার ব্যবসা নয়নতারার নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রি করে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করে চুপচাপ বসে রইল। কিছুদিনের মধ্যেই সবাই দেখবে কাপড়ের মান আগের তুলনায় খারাপ হয়ে গেছে। ঠিক এই সুযোগে টগর তার জমানো টাকা দিয়ে আরেকটি তাঁত নির্মাণ করে কাপড় বুনতে শুরু

করবে এবং সবাই তার কাছ থেকেই কাপড় কিনবে। এভাবে নয়নতারার বিনিয়োগ মাঠে মারা যাবে।

নয়নতারা যদি টগরকেই নিজ কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়ে ব্যবসা শুরু করতো, তাতেও বিশেষ উপকার হতো না। কিছুদিনের মাঝেই টগর নিজের মূল্য বুঝে চাকরি ছেড়ে ব্যবসা শুরু করে দিতো। অথবা নিজে ব্যবসা করে যেই আয় করতো তার সমপরিমাণ পারিশ্রমিক চাইতো। এই কাজ করলে নয়নতারার লাভ কমে শূন্য হয়ে যেতো, কারণ কোন ব্যবসার শ্রমিকরা মালিকের সমান পারিশ্রমিক দাবী করলে মূল পুঁজির মালিক ভাড়ার অধিক কিছু পায় না।

কেবল তাঁতে নয়, চিকিৎসা, মার্কেটিং, রন্ধন, আই-টি থেকে শুরু করে সব ব্যবসাতেই এমনটি হয়ে থাকে। কারণ সবাই সব কাজে পারদর্শী হয় না। আর নিজ পেশায় উচ্চতর দক্ষতার অধিকারীরা তার যোগ্যতার সর্বোচ্চ মূল্য পেতে নিজেই ব্যবসা শুরু করে। ব্যবসা করে সকল সম্পদ অর্জনের পথে আরেকটি বাধা হচ্ছে পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন কোম্পানি এবং ব্যক্তির জন্ম হচ্ছে। তাই প্রতিযোগিতার বাজারে সর্বদা নেতৃত্ব ধরে রাখা যায় না। নতুনরা এসে পুরনোদের জায়গা দখল করে নেয়। এভাবে ব্যবসায় উত্থান-পতন চলতে থাকে।

মূল্যস্ফীতির কারণ

একটি বিষয় লক্ষ্য করুন। ব্যবসায় মুদ্রা কারো হাতে কুক্ষিগত থাকে না। বরং বিনিয়োগের দ্বারা মুদ্রা বার বার বাজারে ফিরে আসে। এছাড়াও, উৎপাদনমুখী ব্যবসার কল্যাণে রাষ্ট্রের মোট উৎপাদন (জিডিপি) বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যের দাম ক্রমশ হ্রাস পায়।

রূপসাগরের কথাই যদি ধরি, নতুন নৌকা তৈরি করার ফলে যে সব জায়গায় পূর্বে মাছ ধরা সম্ভব ছিল না এখন সেই সব জায়গায় মাছ ধরা সম্ভব হয়েছে। ফলে আগে যেখানে দিনে ১০ সের মাছ ধরা পড়ত এখন সেখানে ধরা পড়ে ১ মণ। পূর্বের তুলনায় পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় দুধ এবং মাংসের উৎপাদন বাড়তির দিকে। তাছাড়া পশু দিয়ে হালচাষ এবং ফসল মাড়াইয়ের কাজ করানোর ফলে ফসলের উৎপাদনও সহজ হয়ে গেছে। এভাবে লাগাতার চতুর্মুখি ব্যবসার ফলে দ্বীপের জিডিপি বা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

ব্যবসা দ্বারা মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্বীপে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পূর্বের বেকাররাও উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে। এভাবে রূপসাগরের মানবসম্পদের অভূতপূর্ব উন্নয়ন ঘটেছে। সব মিলিয়ে ব্যবসা একটি দেশের মোট সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি করে।

দ্বীপে যদি নতুন কোন মোহর সৃষ্টি অথবা ধ্বংস না হয়, সর্বদা এক জায়গায় স্থির থাকে, তাহলে ব্যবসা উদ্যোগের ফলে সবকিছুর মূল্য কমে যেতে শুরু করবে। এমনকি ব্যবসার সাথে সম্পর্কহীন সকল পণ্য এবং সেবার মূল্যও হ্রাস পাবে। কারণটা হলো— রূপসাগরে পূর্বের ২০ জন শ্রমিকের স্থলে এখন কাজ করছে ২৫ জন। অথচ বাজারে নতুন কোন মোহর প্রবেশ করেনি। অর্থাৎ, আগের ২০ জনের বেতন এখন ২৫ জনের মাঝে ভাগ হয়ে যাবে। এভাবে কর্মচারীদের গড় বেতন হ্রাস পাবে। তবে আগের তুলনায় কর্মচারীদের কম বেতন দিতে হচ্ছে বলে নয়নতারার আয় রোজকার বৃদ্ধি পাবে না। দ্বীপের সবার সাথে সাথে নয়নতারার আয়ও কমে যাবে। কারণ, তার অধিক উৎপাদিত পণ্য বাজারে মূল্য হারাবে। এমনকি যেসব পণ্য নয়নতারা উৎপাদন করেন না (যেমন— পোশাক) সেসব পণ্যের মূল্যও হ্রাস পাবে। কারণ, এখন সবাই অনেক কম খরচে জীবনযাপন করতে পারবে। আবার মুদ্রার হিসাবে মানুষের আয় কমে গেলে আগের মূল্যে পণ্য কেনার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলবে। ফলে বিক্রেতারাও বাধ্য হয়েই দাম কমাবেন।

মূল্যহ্রাস কেবলমাত্র একটি মুদ্রাগত পরিবর্তন (ঋণগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা)। মূল্যহ্রাস হলে সবাই যেহেতু কম খরচে জীবন যাপন করতে পারেন, অধিক পারিশ্রমিক না পাওয়ায় কেউ ক্ষতিগ্রস্তও হবে না। বরং, 'উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে পূর্বের তুলনায় মুদ্রাধারীর ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।' বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যাক।

মনে করুন, গ্রামের একপাশে নির্জন কুটিরের বাস করে শিউলি বুবু। তার কাছে মোট ৬০টি মুদ্রা সঞ্চিত আছে। অনেক দিন পর পর শিউলি বুবু একবার বাজারে যায়। নতুন নতুন ব্যবসা উদ্যোগ শুরু হওয়ার পর শিউলি বুবু বাজারে গেলেই আগের তুলনায় বেশি পরিমাণ পণ্য কিনতে পারে। কারণ অধিক পরিমাণ মাছ, দুধ এবং মাংস উৎপাদিত হওয়ায় বাজারে এগুলোর দাম কমে গেছে বা মুদ্রাতে বাড়তি মূল্য যোগ হয়েছে। আচ্ছা এই যে, মুদ্রাতে বাড়তি মূল্য প্রবেশ করল, তা কীভাবে সম্ভব হল? এটি সম্ভব হয়েছে এজন্য যে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে সীমিত সংখ্যক মুদ্রা আগের তুলনায় অধিক সম্পদের ভাগিদার হয়। এভাবে মুদ্রাগুলো আরো মূল্যবান হয়ে উঠে।

এমনকি উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কহীন ব্যক্তিরাও এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার সুযোগ পান।

বিষয়টি আরেকভাবে চিন্তা করে দেখা যায়। ধরুন, গত বছর আপনি মাটির নিচে এক কলস টাকা পুঁতে রেখেছেন। কলসে যে পরিমাণ টাকা গত বছর ছিলো, এখনো ঠিক সে পরিমাণ টাকাই আছে। কিন্তু গ্রামে গত বছর দুধ উৎপাদন হয়েছিল ৫০ কেজি, আর এই বছর উৎপাদন হচ্ছে ১০০ কেজি। বাকি সবকিছু আগের মতো থাকলে, দুধের দাম কমে যাবে। এভাবে পুরো অর্থনীতিতে মোট উৎপাদন বেড়ে গেলে এবং সব কিছুর দাম কমে গেলে আপনি মাটির নিচে পুঁতে রাখা কলস থেকে টাকা তুলে সমপরিমাণ অর্থব্যয়ে আগের তুলনায় বেশি পণ্য ও সেবা কিনতে পারবেন। এভাবে কিছু না করেও আপনি উৎপাদন বৃদ্ধির দ্বারা লাভবান হবেন। শুধু আপনি একা না, সমাজের সবাই তাদের মুদ্রার মান ও সম্পদের দাম বৃদ্ধি দ্বারা উপকৃত হবেন। সব মিলিয়ে উৎপাদনমুখি ব্যবসা একটি দেশের মোট সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং এই মূল্যমান সবার মুদ্রা ও সম্পদে প্রবেশ করে। সেকারণেই মুদ্রার দাম বৃদ্ধি পায়, সম্পত্তির মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং পণ্য ও সেবার মূল্য কমে যায়।

যত উৎপাদন, তত কেন মূল্যস্ফীতি

উপরের তত্ত্বগুলো আমাদের প্রতিনিয়ত দেখা বাস্তবতার সাথে মিলছে না। আমরা দেখি, একটি দেশের জিডিপি বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে সব জিনিসপত্রের দাম নাগালের বাইরে চলে যায়। কারণ, মানুষের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেলে সবার হাতে হাতে টাকা চলে আসে। তখন বাজারে সবকিছুর চাহিদাও থাকে বেশি। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীরাও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দেন। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া, পরিবহন খরচ, পড়াশোনার খরচসহ সবকিছুর খরচ বেড়ে যায় এবং সমগ্র অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন দেখা দেয়।

এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য একটি উদাহরণ খুব কাজে দেবে। মনে করি, ঘূর্ণিঝড় এসে রূপসাগরকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেল। দ্বীপের সব গাছপালা, ঘরবাড়ি, ফসলি জমিসহ অন্যান্য সকল সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করল, কেবল মাত্র সোনার মোহর বা কড়িগুলো ছাড়া। সবগুলো মুদ্রা ঠিক আগের মতোই অক্ষত রয়ে গেল। এর ফলে পণ্যমূল্যতে কী প্রভাব পড়বে?

উত্তর হচ্ছে সবকিছুর মূল্য বেড়ে যাবে। কারণ সবার হাতেই এখন পূর্বের সমান মুদ্রা থাকবে কিন্তু সেই তুলনায় সম্পদের পরিমাণ হবে সীমিত। এই সীমিত সম্পদের পেছনে অধিক সংখ্যক মুদ্রা ছোটাছুটি করায় সমগ্র অর্থনীতিতে সবকিছুর দাম বেড়ে মূল্যস্ফীতি দেখা দিবে। আচ্ছা, এমন যদি হতো যে, একজন তাঁতির তাঁত বা তুলা কিছুই নষ্ট হয়নি, সেক্ষেত্রে কি কাপড়ের দাম বেড়ে যেত? উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, সেক্ষেত্রেও কাপড়ের মূল্য বেড়ে যেত। কারণ মানুষ টাকা খেয়ে বাঁচতে পারে না বা টাকার ঘরে শুয়ে ঘুমাতে পারে না। একজন তাঁতিকেও খাবার কিনে খেতে হয় এবং ঘর তৈরি করে থাকতে হয়। সব পণ্য ও সেবার মূল্য বেড়ে গেলে, তাঁতিকেও কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি করতে হতো। অন্যথায়, তার নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদাগুলো অপূর্ণ থেকে যেত। এভাবে দ্বীপের সব কিছুর দাম বেড়ে যাওয়াকে অর্থনীতির ভাষায় বলে মূল্যস্ফীতি। অর্থাৎ, *'কোন অর্থনীতিতে মোট সম্পদের পরিমাণ কমলে কিন্তু মুদ্রার সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলে, মূল্যস্ফীতি দেখা দেয়।'*

আবার ধরি, দ্বীপের সবকিছু আগের মতোই আছে। কেবল যার যার মুদ্রা অর্ধেক উধাও হয়ে গেছে। তাতে কী হবে? শুনলে অবাক হবেন যে এর ফলে কেউ দরিদ্র হয়ে যাবে না, বরং প্রত্যেকের অবস্থা সম্পূর্ণ আগের মতই থাকবে। কারণ তখন সব কিছুর দাম গড়পড়তা অর্ধেক হয়ে যাবে।

ঠিক একই প্রশ্ন এবারে আরেকভাবে উপস্থাপন করি। রূপসাগরের জনসংখ্যা আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বাড়তি জনসংখ্যার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মোট উৎপাদন আগের তুলনায় বিপুল বেড়েছে। দ্বীপে নতুন নতুন বন জঙ্গল সাফ করে এখন কৃষিকাজ, পশুপালন ও পোশাক তৈরি করা হচ্ছে, কিন্তু মুদ্রার সংখ্যা সেই আগের সমানই আছে। এর ফলাফল কী হবে?

এক্ষেত্রেও সবকিছুর মূল্য কমে যাবে কারণ, *'মোট সম্পদের পরিমাণ বেড়ে গেলে কিন্তু মুদ্রার সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলে মূল্যহ্রাস দেখা দেয়।'*

সেইমতে আমাদের অঞ্চলেও উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু প্রতিনিয়ত পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে কেন?

এর কারণ হচ্ছে জিডিপির তুলনায় টাকার পরিমাণের প্রচণ্ড ঊর্ধ্বগতি। যদি এমন হয় যে দেশের জিডিপি বাড়লো ৫ শতাংশ কিন্ত মুদ্রার পরিমাণ বাড়লো ১৫ শতাংশ, সেক্ষেত্রে প্রায় ১০ শতাংশ মূল্যস্ফীতি বা ইনফ্লেশন বজায় থাকবে। আমাদের দেশের অর্থনীতিতে যেহেতু প্রতি বছর টাকার পরিমাণ জিডিপির তুলনায় ব্যাপকহারে বাড়ছে, সেকারণে জিডিপি ক্রমবর্ধমান

থাকা সত্ত্বেও মূল্যস্ফীতি অব্যাহত আছে।[৬] অর্থাৎ, পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবসায়ীরা দায়ী না, বরং মুদ্রাস্ফীতির কারণে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করতে তারা বাধ্য হন। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যোগাযোগের সমস্যা, কিংবা সম্পদের স্বল্পতার কারণে পণ্যমূল্য সাময়িকভাবে বেড়ে থাকে। এটি একটি ক্ষণস্থায়ী এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া।[৭] ধীরে ধীরে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে।

এই ব্যাপারে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অর্থনীতিবিদ মিল্টন ফ্রিডম্যান বলেছেন :

> *'Inflation is always and everywhere a monetary phenomenon in the sense that it is and can be produced only by a more rapid increase in the quantity of money than in output.'*
>
> –Milton Friedman
> American economist and statistician, received Nobel Prize in 1976

> *'সবসময় এবং সব জায়গায় মূল্যস্ফীতি একটি মুদ্রাজনিত কারবার, কারণ মোট উৎপাদনের তুলনায় মোট মুদ্রার পরিমাণ অত্যধিক হলেই মূল্যস্ফীতি ঘটে।'*
>
> — মিল্টন ফ্রিডম্যান
> অর্থনীতিবিদ (নোবেল পুরস্কার-১৯৭৬)

প্রশ্নোত্তর পর্ব

রূপসাগরের সেরা শিক্ষাকেন্দ্র অপরূপ বিশ্ববিদ্যালয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের জনাব রিবা অডিটোরিয়ামে একটা সেশন চলছে। সেশনে বক্তব্য রাখছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ জনাব মোমেন পায়ারি। (পাহাড়ি না, মুদ্রণে ভুল নাই)

> **প্রশ্ন ০১ :** *নবীন উদ্যোক্তা সেবা প্রশ্ন করেছেন, 'একজন ব্যক্তির নিকট খুব ভালো একটি ব্যবসায়ীক পরিকল্পনা আছে। তার হাতে যদি যথেষ্ট পরিমাণ টাকা না থাকে, সুদে ঋণ নিলে ক্ষতি কী? ব্যবসায় লাভ যদি থাকে ১৫% এবং বাজারে সুদের হার চলে ১০%, অবশ্যই ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করা সম্ভব।*

---

৬ মুদ্রাস্ফীতির জন্য সাধারন ব্যাংক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংক উভয়ই দায়ী, যেহেতু তারা উভয়ই টাকা ছাপায়। এই ব্যাপারে সামনে বিস্তারিত আলোচনা আসছে।

৭ গুদামজাত করে বা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ব্যবসা প্রক্রিয়াতেও পণ্যমূল্য সাময়িক বৃদ্ধি করা সম্ভব। এমন অসংখ্য অসাধু উপায় আছে। তবে সব মিলিয়ে মুদ্রাস্ফীতিই এই ব্যাপারে সবার চেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে।

একথা অনস্বীকার্য যে, তিনি যদি নিজের টাকায় ব্যবসা করতে পারতেন অথবা কেউ তাকে বিনা সুদে ঋণ দিত, তা খুবই উত্তম বিকল্প হতো। কিন্তু এই ব্যক্তিকে ধার দেবার মতো কোনো বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন নেই এবং তার নিজের পুঁজিও নেই। সেক্ষেত্রে ব্যাংক ঋণ নিয়ে তিনি একটি সফল ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে কি কারো ক্ষতি হতো? বরং এই ব্যবসার কল্যাণে একজন বেকার ব্যক্তি সফল ব্যবসায়ীরূপে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পাশাপাশি সমাজের অপর কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে পারত। সবমিলিয়ে এই ঋণ নেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলেই তো সমাজ এবং রাষ্ট্র সব দিক থেকে বঞ্চিত হতো।

তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সুদ কি সমাজের ক্ষতি করল নাকি উপকার করল?'

উত্তর : মোমেন পায়ারি, 'ব্যবসা করা অর্থনীতির জন্য উত্তম। কিন্তু ব্যবসার দরজা খুলতে গিয়ে আমাদের কর্মফলে সমাজের সবার মুদ্রা একজনের হাতে চলে যাওয়ার উপক্রম হলে, তা থেকে বিরত থাকা দরকার। নিজের উন্নতি করতে গিয়ে সবার ক্ষতি ডেকে আনা এড়াতেই সুদকে আমরা আমরা পরিহার করবো।'

প্রশ্ন ০২ : *রাজা মিয়া, 'কিন্তু জনাব, বিষয়টি পরিষ্কার যে আলোচ্য ব্যবসায়ী সুদে ঋণ না পেলে ব্যবসার মূলধন জোগাড় করতেই পারতেন না। সেক্ষেত্রে, গ্রাহক এবং ব্যাংক নিজেরাই নিজেদের মধ্যে স্বেচ্ছায় সুদের চুক্তি করলে, এটা তো তাদের ব্যক্তিগত লেনদেন। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সমাজ কেন নাক গলাবে?*

আমার কথা হচ্ছে ব্যাংক থাকলে থাকুক। সমাজের মানুষ নিজের প্রয়োজনমাফিক ঋণ নিবে বা এড়িয়ে যাবে। সুদকে সমূলে উচ্ছেদ করার বা সুদি প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঘৃণা করার যুক্তি কোথায়? তারা তো আপনার সম্পদ জোর করে কেড়ে নিচ্ছে না।'

উত্তর : মোমেন পায়ারি, 'এই যুক্তিগুলো বিশ্লেষণে সূক্ষ্মদৃষ্টি বজায় এবং সংকীর্ণতা পরিহার করা জরুরি। ভুলে গেলে চলবে না যে সুদের উপর দাঁড়ানো ব্যবসায় বাড়তি ঝুঁকি এবং মানসিক পীড়া জড়িত। তবে আমাদের আলোচনার বিষয় সেইটা না। প্রশ্ন হচ্ছে, সুদে ঋণ নিয়ে ভালো কিছু অর্জন করা সম্ভব কিনা? একজন উদ্যোক্তার সাময়িক অসুবিধার বিনিময়েও যদি সমাজ সামগ্রিকভাবে উপকৃত হয় এই অধ্যায়কে আমরা সমাজ থেকে

উচ্ছেদ করতে পারি না? বরং আরো উৎসাহিত করতে পারি। এর একটি উত্তম উদাহরণ হচ্ছে অপরাধীর জন্য শাস্তির বিধান। শাস্তিভোগের বিষয়টা অপরাধী এবং তার পরিবারের জন্য অতীব বেদনাদায়ক। তা সত্ত্বেও সমাজ বলপূর্বক একজন অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে থাকে। কারণ একজনের কষ্টের বিনিময়েও সমাজের সিংহভাগ সদস্য উপকৃত হয়ে থাকেন। ঠিক তেমনিভাবে সুদে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করে মানসিক ও আর্থিক যন্ত্রণা সত্ত্বেও একজন ব্যবসায়ী যদি সমাজকে ভালো কিছু উপহার দিতে পারেন, সুদ থাকা প্রয়োজন। অপরপক্ষে, সুদে ঋণ নিয়ে তিনি উপকৃত হলেও সমাজ যদি সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সুদকে বর্জন করা উচিত। কারণ অপরাধীমাত্রই অপরাধ দ্বারা লাভবান হয়ে থাকেন। দুইজন ব্যক্তি যখন ঘুষ আদান-প্রদান করেন, ঘুষ গ্রহীতা এবং ঘুষদাতা উভয়ই লাভবান হন। ঠিক তেমনি সুদে ঋণ গ্রহণকারী, সুদে ঋণ প্রদানকারী এবং সুদের সাক্ষী, প্রত্যেকেই লাভবান হন। প্রশ্ন হচ্ছে সমাজ লাভবান হচ্ছে কি? ভালো ও মন্দের বিচার সেই কষ্ঠিপাথরেই নিরুপণ করতে হবে।

দেখুন, একটি নির্দিষ্ট সীমার পরে ঋণগ্রহীতাদের সবার পক্ষে সব টাকা ফেরত দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। এর ফলে তৈরি হয় ঋণখেলাপি ও অন্যান্য জটিলতা। এভাবে কালক্রমে সকলের মুদ্রা এবং পরবর্তীকালে সকল সম্পদ এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হয়। অথচ অংশীদারিত্ব ব্যবসায় সুষম বণ্টন ও সুদমুক্ত ঋণে সহমর্মিতা থাকায় অর্থনৈতিক ঝুঁকি ন্যায্যতার সাথে ভাগ হয়ে যায় এবং সকল মুদ্রা একহাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেজন্যই সুদকে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা উচিত এবং অংশীদারিত্ব ব্যবসা ও সুদমুক্ত ঋণকে উৎসাহিত করা উচিত।

অডিটোরিয়ামের করতালির বন্যা রাজা ভাইকে বাড়ির পথ ধরিয়ে দিল। আজকে জনাব রিবা বেঁচে থাকলে খুব কষ্ট পেতেন, তার নামাঙ্কিত অডিটোরিয়ামেই 'সুদ'বিরোধী বাণী, আহা!

প্রশ্ন ০৩ : *নাদান, 'আচ্ছা, ইয়োরোপ মহাদেশে রূপসাগরের থেকেও বড় বড় দেশ আছে। সেসব বৃহৎ রাষ্ট্রে অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাংক আছে। সেখানে রাজা ভাইয়ের মতো এরকম একচেটিয়া মহাজনী প্রথা নেই, প্রশ্ন হচ্ছে সেক্ষেত্রে ফলাফল কী একই রকম হবে?'*

উত্তর : মোমেন পায়ারি, 'আপনি এক ফোঁড়ার জ্বালাতেই বাঁচেন না, আবার ছোট ছোট ফোঁড়া সারা গায়ে, বলেন কী?' অডিটোরিয়ামে হাসির রোল পড়ে গেলেও তিনি বলে চললেন, 'সেক্ষেত্রে একটি ব্যাংক নয় বরং ব্যাংকব্যবস্থা একত্রে সব মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ করবে এবং আরো গতিময়তার সাথে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করবে।'

প্রশ্ন ০৪ : *পণ্ডিত মশাই, 'অর্থনীতির পুস্তকসমূহ পড়ে আমরা জানতে পারি যে, সমাজে কিছু মানুষের হাতে অলস টাকা জমা পড়ে থাকে, আবার কিছু মানুষের জীবনে টাকার খুব প্রয়োজন। ব্যাংক এই দুই শ্রেণির মধ্যে মধ্যস্থতা করে দিচ্ছে, এটি একটি মহান উদ্যোগ। ব্যাংক সুদ গ্রহণ করে সত্য কিন্তু লাভ ছাড়া একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান কেন টাকা ধার দিবে? তাছাড়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার ও পরিচালনার খরচ তো আছেই। পাশাপাশি গ্রাহকের দেউলিয়া হবার ঝুঁকিও ব্যাংক নিচ্ছে। তাহলে, কেন তাদের এই চমৎকার অবদানকে আমরা খাটো করে দেখব?'*

উত্তর : মোমেন পায়ারি, 'আপনার কথাগুলো সঠিক। তবে সুদ কেবল মাত্র ব্যাংক এবং গ্রাহকের ব্যক্তিগত লেনদেন না। সুদের প্রভাব সম্পূর্ণ সমাজে জীবাণুর মত ছড়িয়ে পড়ে এবং গুটিকতক মানুষ সাময়িক লাভবান হলেও অর্থনৈতিক বৈষম্যের দ্বারা এবং মুদ্রাপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণের ফলে সমগ্র সমাজ এমনকি ঋণগ্রহীতাও ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে সমাজের বাড়তি মুদ্রাধারী ও সীমিত মুদ্রাধারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা অত্যন্ত জরুরি। এই মহৎ কাজটি সুদভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া কীভাবে আমরা সাধন করতে পারি, সেটা বিস্তারিত আলোচনার দাবি রাখে। প্রাথমিকভাবে এর উত্তর হচ্ছে, সুদমুক্ত ঋণের লেনদেন, ব্যবসা বিনিয়োগের মাধ্যমে ফাইনান্সিং এবং ন্যায্য মুদ্রাব্যবস্থা। আল্লাহ চাইলে, এগুলো নিয়ে পরবর্তী বইগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা রাখব।'

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাংকব্যবস্থা এবং দেউলিয়াত্ব

এই পর্যন্ত আমরা দেখেছি সুদ এবং ব্যবসার পার্থক্য কী, কীভাবে সুদের চক্র দ্বারা সব মুদ্রা সুদি ব্যক্তির মালিকানায় চলে যায়, ব্যবসার সাথে অর্থনীতি ও মুদ্রাব্যবস্থার সম্পর্ক কী? কিন্তু সব মুদ্রা সুদি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হাতে আসার পরেও সুদের চাকা ঘুরতে থাকলে ঋণীদের গন্তব্য কোথায় হবে? সেই প্রশ্নটির উত্তর জানতে ধরে নিই যে রূপসাগরের অর্থনীতি একালে বিশালাকৃতি ধারণ করেছে এবং সাথে সাথে ব্যবসা কার্যক্রমও বড় হয়েছে। রিবা পরিবারের তৃতীয় প্রজন্মের সদস্য 'আমোদ' রূপসাগরের প্রথম ব্যাংক, 'রামিম[৮] ব্যাংক' প্রতিষ্ঠা করেছে।

সুদের সেই গদির উত্তরাধিকারী হওয়ায় রামিম ব্যাংকের হাতেই এখন রূপসাগরের সমস্ত মুদ্রা। তবে সব মুদ্রা রামিম ব্যাংকের অধীনে আসাতে অর্থনীতি থমকে যায়নি, বরং আগের নিয়মেই সকল কেনাবেচা, ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি এবং কৃষিকাজ চলছে। কিন্তু মুদ্রা বলতে যা বোঝায়, তা ব্যাংকের কাছ থেকেই ঋণ আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করছে। এই ঋণ পাবার জন্য সকল অধিবাসীকে ব্যক্তিগতভাবে আলাদা আলাদা করে ব্যাংকের কাছে আসতে হবে না। পাইকারি বিক্রেতাদের থেকে খুচরা বাজার হয়ে যেমন সবার ঘরে ঘরে পণ্য পৌঁছে যায়, ঠিক তেমনি করে গুটিকয়েক মুষ্টিমেয় ব্যক্তি ঋণ নিলেই, তাদের মাধ্যমে দ্বীপের সবার হাতে হাতে মুদ্রা ছড়িয়ে পড়বে। কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারবে না, অন্তরালে কী ঘটছে।

একজন ব্যবসায়ী সুদে ঋণ নিয়ে কেনাকাটা করবেন বা কর্মচারিদের পারিশ্রমিক দিবেন, তখন ঋণের মুদ্রা তার হাত থেকে অন্যদের হাতে চলে যাবে। তারপরে, শ্রমিক কিংবা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সেই মুদ্রাগুলো নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করলে, সেগুলো সবার হাতে ছড়িয়ে পড়বে।

---

৮ আরবি রামিম শব্দের বাংলা অর্থ 'ধ্বংসপ্রাপ্ত'

এভাবে একটি অর্থনীতিতে সবগুলো মুদ্রা ঋণের আকারে প্রবেশ করলেও সাধারণ মানুষের চোখে তা ধরা পড়বে না। একজন ব্যবসায়ীর কথাই চিন্তা করুন, তিনি ১০০টি কড়ি ঋণ নিয়ে নিজের কারখানার শ্রমিকদের প্রাপ্য মজুরি প্রদান করলেন। কিছুদিন বাদে শ্রমিকেরা বাজারে গিয়ে একজন কৃষকের কাছ থেকে ৫ কড়ির চাল কিনলে, সেই কৃষক ভাববে এই ৫টি কড়ি সম্পূর্ণ ঋণমুক্ত। আসলেইতো, এত কষ্টের কামাইতো তো ঋণের টাকা না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে একজন ব্যবসায়ী এই কড়ি ঋণ আকারে গ্রহণ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তা ঘুরে ফিরে কৃষকের হাতে এসে পৌঁছেছে।

এভাবে ব্যাংক সকল মুদ্রার মালিক হলে এবং প্রতিনিয়ত কিছু ব্যক্তি ব্যাংকের থেকে ঋণ নিলে খুব সাবলীলভাবে মুদ্রাগুলো বাজারে ঘুরে বেড়াবে। রূপসাগরের সব মুদ্রার মালিক রামিম ব্যাংক হয়ে থাকলেও, কেউ ঘুণাক্ষরেও মূল রহস্য টের পাবে না। সবাই মনে করবে, তাদের হাতের কড়ির মালিকানা তাদেরই। কিন্তু বাস্তবে সব কড়ির স্বত্বাধিকারী ব্যাংক কেবলমাত্র ব্যবহারের জন্য এগুলো ভাড়া দিচ্ছে। সেই ভাড়ার কড়িতেই বেচাকেনা, সঞ্চয় সবকিছু চলছে। যেহেতু ব্যাংক কাউকে বিনা সুদে ধার দেয় না, এরূপ একটি অর্থনীতিতে একটা কানাকড়িও 'সুদমুক্ত' থাকবে না।

চিন্তাশীল পাঠকরা নিশ্চয়ই ভাবছেন, সব কড়িই ঋণ আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করলে, সুদ পূরণ হবে কোথা থেকে?

দ্রুত একটি হিসাব কষে নেই। বর্তমানে রূপসাগরে মোট ২০,০০০টি কড়ি আছে। এই সবগুলো কড়িই রামিম ব্যাংকের। বাজারে সুদের হার ১০% হলে পরের বছর ব্যাংক ২২,০০০টি কড়ি ফেরত চাইবে। কিন্তু দ্বীপে আছেই কেবল ২০,০০০টি কড়ি। কড়ি ডিম পেড়ে সংখ্যাবৃদ্ধি করে না বিধায় এই ঋণ পরিশোধ করা অসম্ভব। অর্থাৎ, এমন একটি সমাজে কিছু সংখ্যক গ্রাহকের জন্য ঋণখেলাপি হওয়া গাণিতিকভাবে আবশ্যক। কথাটি পরিপূর্ণ সত্য।

এই পর্যন্ত ঋণী ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া হওয়া 'বাধ্যতামূলক' ছিল না। কিন্তু এই পর্যায়ে এসে শতকরা দশ শতাংশ গ্রাহকের জন্য ঋণখেলাপি হওয়া আবশ্যক। সুদের হার পাঁচ শতাংশ হলে গড়ে পাঁচ শতাংশ গ্রাহকের জন্য দেউলিয়া হওয়া বাধ্যতামূলক, আবার সুদের হার বিশ শতাংশ হলে গড়ে বিশ শতাংশ গ্রাহক দেউলিয়া হবে।

ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থায় ঋণখেলাপি ব্যক্তিদেরকে অযোগ্য এবং ঠগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে; তাদেরকে সামাজিকভাবে বয়কট করতে উদ্বুদ্ধ করে থাকে। অথচ, সামান্য কিছু সংখ্যক অসৎ ব্যক্তি বাদে অন্যসব ঋণখেলাপি কার্যত অপরাধী নয়, বরং ব্যাংকের প্রত্যক্ষ শিকার। কারণ,

ঋণগ্রহীতারা নতুন টাকা ছাপাতে পারে না। তাই, কিছু সংখ্যক গ্রাহক ঋণ খেলাপি হবে। এর থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই।

জনাব রিবা, রাজা কিংবা আমোদ এতক্ষণ পর্যন্ত সম্পত্তি বলতে কেবল কড়ি অর্জন করেছিল। কিন্তু অর্থনীতির সব কড়ি ব্যাংকের হস্তগত হতেই, স্থায়ী সম্পত্তিও তাদেরই মালিকানায় ঢুকতে শুরু করল। সমীকরণটি অনেকটা এমন— রামিম ব্যাংক এই বছর সমাজের সকলকে ২০,০০০টি কড়ি ঋণ দিয়ে পরের বছর ২২,০০০টি কড়ি ফেরত চাইছে। সাগর থেকে বছরে কেবল ১০০টি ভেসে আসছে। সুতরাং, আগামী বছর সবাই মিলে ২০,১০০টি কড়ি এবং ১,৯০০টি কড়ির সমপরিমাণ সম্পত্তি ফেরত দিবে। ব্যাংক চাইলে এই সম্পত্তি নিজের কব্জায় তালাবদ্ধ রেখে দিতে পারে অথবা বাজার দরে বিক্রি করে দিতে পারে। যেটাই করুক না কেন, ঋণ দেওয়া মুদ্রার পরিমাণ মোট ফেরত চাওয়া মুদ্রার চেয়ে কম বিধায় প্রতি বছর কিছু ব্যক্তি দেউলিয়া হতেই থাকবে, আর দেউলিয়া ব্যক্তিদের সম্পত্তি চুম্বকের মতো ব্যাংকের কব্জায় আসতে থাকবে। কড়ি (টাকা) ছাড়া মানুষ অচল বলে, এই চক্র থেকে বের হবার কোন উপায় নেই (সম্পূর্ণ মুদ্রাব্যবস্থা পরিবর্তন করা ছাড়া)। যতদিন পর্যন্ত কড়ির লেনদেন বাজারে চালু থাকবে, ততদিন পর্যন্ত ব্যাংকের নিকট স্থায়ী সম্পত্তি চলে যাওয়া অব্যহত থাকবে। এভাবে ব্যাংকের সম্পত্তি কেবল বাড়তেই থাকবে।[৯]

চিন্তার টোটকা

কখনো মনোপলি খেলেছেন? খেলাটাতে টাকার পরিমাণ বাড়ে না। জমি, বাড়ি, হোটেল ও অন্যান্য সুবিধাও একেবারে সীমিত। তাহলে একজন খেলোয়াড় সব সম্পত্তির মালিক হওয়ার মাধ্যমে জিতে কীভাবে? হ্যাঁ, অন্য খেলোয়াড়দের দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার মাধ্যমে। সুদি সমাজের বাস্তবতাও ঠিক এমনই।

> *'When plunder becomes a way of life for a group of men in a society, over the course of time they create for themselves a legal system that authorizes it and a moral code that glorifies it.'*
>
> –Claude-Frédéric Bastiat
>
> French economist, writer & member of the French National Assembly (1801-1850)

৯ এই বৃদ্ধির হার সুদের হারের সমানুপাতিক।

'লুটপাট করাটা সমাজের একদল মানুষের জীবিকার মাধ্যম হয়ে উঠলে, তারা সেটাকে বৈধ করার জন্য আইন খাড়া করে, আর এই অবৈধ কর্মকাণ্ডকে ভিত্তি দিতে নৈতিকতার বুনিয়াদও তৈরি করে।'

— ক্লদেফ্রেডেরিক বাসতিতাত
ফ্রেঞ্চ অর্থনীতিবিদ, লেখক ও ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির সদস্য (১৮০১-১৮৫০)

ভেলার ভেলকি

মনে করি 'পয়সাবিহীন' একটি সমাজে 'ভেলা' নামের ক্ষুদ্র-ঋণ সংস্থা প্রত্যেক পরিবারকে ১০টি পয়সা ঋণ দিয়ে বছরান্তে ১১টি পয়সা ফেরত চাইল। ঋণে পাওয়া পয়সা ছাড়া ঐ দরিদ্র সমাজে আর কোন পয়সা নাই।

ভেলা যদি মোট একশটি পরিবারকে ক্ষুদ্র-ঋণ দিয়ে থাকে তাহলে ভেলা মোট পয়সা দিয়েছে ১,০০০টি। এখন, মোট ১,১০০ পয়সা ফেরত চাওয়াটা কি যৌক্তিক? নিশ্চয়ই না, কারণ পরিবার প্রতি গড়ে ১০টি পয়সা আছে, ১১টি পয়সা তারা দিবে কোথা থেকে? ঋণ নেবার পরেই সুদের পয়সা সংগ্রহ করতে তাই পরিবারগুলো নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করবে (মারামারি করাটাও অস্বাভাবিক নয়)। এভাবে সর্বোচ্চ ৯০টি পরিবার সম্পূর্ণ দায় পরিশোধ করতে সক্ষম হবে। তারা সবাই মিলে দিবে ৯০×১১=৯৯০টি পয়সা। অপরিশোধিত ঋণের দায় পূরণ করতে ঋণগ্রহীতাদের ব্যক্তিগত সম্পদ জব্দ করে 'ভেলা'র নামে লিখে দেওয়া হবে।

সুতরাং, সুদি সিস্টেম মানেই সুদি মহাজনের জন্য অবারিত সম্পত্তি অর্জনের দুয়ার খুলে দেওয়া। ব্যাংক যে খুব কায়দা করে সম্পত্তি অর্জন করছে তা নয়, বরং এটি একটি ফাঁক-ফোকরবিহীন মেশিন যা সবার সম্পত্তি নিশ্চিতরূপে চুষে গলধকরণ করে। কিছু দক্ষ ব্যক্তিকে নিয়োগ করে এই মেশিনটি চালানোর দায়িত্ব দিলেই ব্যস নিশ্চিন্ত, মালিক হিসেবে ব্যাংকারের আর কোন চিন্তা নেই। পেশির জোরে মেশিনটাকে সমাজে বসিয়ে রাখতে পারলেই কেল্লাফতে।

ভাবুনতো, দেশসেরা মেধাবীরা তাদের সমস্ত মেধা নিঙড়ে ব্যাংকে কাজ করে কি শুধুই ক্যারিয়ার গড়ছে এবং পাশাপাশি সমাজের উপকার করছে? নাকি তাদের আশেপাশের সবকিছুর পতন ও জুলুম ত্বরান্বিত করছে?

ঋণের চাকা

এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা ধরে নিয়েছি মহাজন (বা ব্যাংক) একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণ দিয়ে, কিছুদিন পরে সবার থেকে তা সুদে আসলে ফেরত নিবে।

আমরা মোট দুইটি সরলীকরণের শর্ত জুড়ে দিয়েছিলাম—

১. সবাই একসাথে ঋণ নিবে।

২. সবাই একসাথে সুদে আসলে সেই ঋণ ফেরত দিবে।

প্রকৃতপক্ষে, ব্যাংক সব ঋণ একসাথে দেয় না। আবার সব ঋণ একসাথে ফেরতও নেয় না। এক এক দিন, এক একজন গ্রাহক ব্যাংকের সাথে এক এক রকম লেনদেন করে। এই দেওয়া নেওয়া কর্যক্রম কুমোরের চাকার মতো ঘুরে ঘুরে চলতে থাকে, এবং সময়ের সাথে চাকার আকৃতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। আরেকটি ব্যপার হচ্ছে সব মুদ্রা ঋণ হয়ে গেলে আসল ফেরত দেওয়া খুব কঠিন হয়ে যাবে। কারণ আসলের সম্পূর্ণ টাকা ফেরত দেওয়া হবে একরকম ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার শামিল। কিন্তু, সবাই ঋণ ধরে রেখে শুধু সুদ প্রদান করতে থাকলে (যেমনটা আমরা বর্তমান বিশ্বে দেখি) মুদ্রাব্যবস্থা ও অর্থনীতিতে ভারসাম্য রক্ষা পাবে?

সুদরূপি অ্যানাকোন্ডা

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রথমেই ব্যক্তি জীবনের আয়নায় সুদের প্রভাব খুঁজি। মনে করি, সজীব নামের একজন তরুণ ব্যবসায়ী পৈতৃক ভিটে জামানত দেখিয়ে ব্যাংক ঋণ নিয়ে একটি ব্যবসা শুরু করল। তার ব্যবসার রিটার্ন ২৫% এবং সুদের হার ১৫%। সে মোট ১.২ কোটি টাকা ঋণ নিলে প্রতি মাসে তার লাভ থাকে ২.৫ লাখ টাকা এবং সুদ আসে ১.৫ লাখ টাকা। মাস প্রতি সজীবের হাতে 'নীট মুনাফা' থাকে ১ লাখ টাকা।

নবম বছর ব্যবসায় মন্দা লাগলো এবং সেই বছর সজীব সুদ প্রদান করতে ব্যর্থ হল। ব্যাংক পরিচালক তা শুনে বলবেন, 'কোন সমস্যা নেই, এই বছরতো দেশে মন্দা চলছে, অনেকেই সুদ দিতে পারেন নাই। আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। আমরা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী আপনার বিফল হওয়া সুদ দায় হিসেবে যুক্ত করে রাখব। আপনি আপনার সুবিধা মতন সময়ে পরিশোধ করে দিয়েন।'

অর্থাৎ, দশম বছর মোট দায় ১৫% বেড়ে দাড়াবে ১.৩৮ কোটি টাকা এবং প্রতি মাসে সুদ ১৫% বেড়ে ১.৭২ লাখ টাকা হবে। লক্ষ্য করুন, সজীবের লাভ হচ্ছে মাসে ২.৫ লাখ টাকা কিন্তু সুদ আসছে মাসে ১.৭২ লাখ টাকা। অর্থাৎ, সুদ পূরণ করার পরে হাতে থাকছে এখন ৭৮ হাজার টাকা। এক কথায়, পণ্য মূল্য বৃদ্ধি ব্যতীত আগের ঠাট-বাটে সংসার চালানোর কোন উপায় নেই। দেখা গেল ক্ষতি কাটিয়ে আবার আগের অবস্থানে ফিরতে তার আরো দুই বছর লেগে গেছে।

অর্থাৎ, ব্যবসা ঘুরে দাঁড়ানোর পরে তার মোট ঋণের পরিমাণ বেড়ে হবে ১.৮২৫ কোটি টাকা এবং এর বিপরীতে প্রতি মাসে সুদ আসবে ২.২৮ লাখ টাকা।*

অর্থনৈতিক মন্দা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়াও নানা কারণে ব্যবসায় লোকসান তো লেগেই থাকে। প্রতি বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে সুদ দেওয়া কোন ব্যবসায়ীর পক্ষেই সম্ভব না। মাঝে মাঝে কিছু কিস্তি ছুটে যেতেই পারে। এই উদাহরণে প্রথম ১২ বছরে যেমন তিনটা কিস্তি বিফল হয়েছে, তেমনি করে পরবর্তী ১২ বছরে আরো ৩টি কিস্তি ছুটে গেলে। তখন কি হয় দেখুন :

> ৪ বার সুদ পরিশোধ না করলে, মোট দেনা হবে ২ কোটি টাকা এবং মাসিক সুদ পৌছাবে ২.৬২ লাখ টাকায়। (পণ্য মূল্য বৃদ্ধি, নয় দেউলিয়া)
>
> ৫ বার সুদ পরিশোধ না করলে, মোট দেনা হবে ২.৩ কোটি টাকা এবং মাসিক সুদ দাড়াবে ৩ লাখ টাকায়।
>
> ৬ বার সুদ পরিশোধ না করলে, মোট দেনা হবে ২.৬৪৫ কোটি টাকা এবং মাসিক সুদ আসবে ৩.৪৫ লাখ টাকা।

বাকি হিসেবগুলোতে আর না যাই। ব্যাপক পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সুযোগ না থাকলে সজীব সম্পূর্ণ নির্জীব হয়ে দেউলিয়া ঘোষণা করে ভিটেমাটিও হারাবে।

আপনারা যদি ভেবে থাকেন, প্রতি বছর নিয়মমাফিক সুদ দিলে সজীবকে তার সজীবতা হারাতে হতো না অর্থাৎ, চক্রবৃদ্ধির ফাঁদে পড়তে হত না। তাহলে আপনাদের জেনে রাখা জরুরি যে, কোন ব্যবসাই চিরকাল লাভ

---

* উল্লেখ্য যে ঋণের মোট পরিমাণ বেড়ে গেলে, credit rating খারাপ হয়ে সুদের হারও বৃদ্ধি পাবে, ১৫% এ থাকবে না। কেবলমাত্র হিসেবের সুবিধার জন্য আমরা তা আমলে নিচ্ছি না।

থাকতে পারে না, লোকসান আছেই। তাই ঋণের চক্রে পড়লে পুরো ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানকেই ব্যাংকের পেটে চলে যেতে হবে।

আমাজন জঙ্গলের অ্যানাকোন্ডা সাপের নাম শুনেছেন? এই সাপ যখন আপনাকে পেঁচিয়ে ফেলে বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দেয় নিশ্বাস না ফেলে বের হবার চেষ্টা করতে। কারণ আপনি প্রতিবার নিশ্বাস ফেলার জন্য বুক সংকুচিত করতেই অজগর তার চাপ বৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে শিকারের বুক একেবারে সংকুচিত হয়ে যায় এবং অক্সিজেনের অভাবে মারা পড়ে। ঋণ হচ্ছে এমনই একটি ফাঁদ। যতবার আপনি সুদ মিস করেন, ততবার তা আপনাকে চেপে ধরে। এবং ঋণের চাপে আষ্টে-পৃষ্টে আপনি দেউলিয়া হয়ে যান।

বর্তমান বিশ্ব এভাবেই চলছে। কোন কোম্পানি ব্যাংকঋণ নিতে চাইলে, ব্যাংক তাদের ক্রেডিট রেটিং (ঋণ সক্ষমতা) যাচাই সাপেক্ষে সেই অনুযায়ী সুদের হার নির্ধারণ করে। একটি কোম্পানির ক্রেডিট রেটিং ভালো হলে সুদের হার কম রাখা হয়, আর খারাপ হলে সুদের হার বেশি। ঋণী কোম্পানি সুদ প্রদানে ব্যর্থ হলে, ঋণের বোঝা বড় হয়, ক্রেডিট রেটিংয়ের অবনতি হয় এবং সুদের হার বৃদ্ধি পায়। বাজে রেটিংওয়ালাদের ঋণ ব্যাংক নবায়ন করতে নারাজ হলে কোম্পানি তখন নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে।

আপনারা ভাবতেই পারেন, 'একজন ব্যবসায়ীর ঋণ নেওয়ার কী প্রয়োজন? ঋণ নেওয়া ছাড়া ব্যবসা করলেই তো ঝামেলা চুকে যায়। কেউ তো ঋণ নিতে কাউকে বাধ্য করছে না, ইত্যাদি।' আপনার ধারণা সঠিক, আবার ভুলও। একটি অর্থনীতিতে যখন 'ঋণ=টাকা' হয়ে যায়, তখন কাউকে না কাউকে ঋণ নিতেই হয়, কারণ ঋণ নেই মানে কোন টাকাও নেই। এমন একটি পরিস্থিতিতে ঋণ নেওয়া ছাড়া ব্যবসা করাটা দুঃসাধ্য আর ঋণ মুক্ত হওয়া তো স্বপ্ন।

টিকা-মূলধনের মূলা

বাংলাদেশের একজন শিল্পপতি ঋণ নিয়ে কী করেন? জমি কেনেন, ফ্যাক্টরি বানান, মেশিন আমদানি করেন, লাইসেন্সের জন্য ঘুষ দেন, কাঁচামাল অর্ডার করেন। এভাবে সব টাকা তো ব্যয় হয়ে যায়। সুদ-আসলে ঋণ ফেরত দিবেন কেমনে?

শুধু বাংলাদেশ কেন, চীন-জাপান-উগান্ডা-মেক্সিকো সব জায়গার শিল্পপতিই ঋণ নিয়ে একই কাজ করেন।

তাহলে আসুন, চট করে একটা হিসাব কষে আসি। ধরি, একজন শিল্পপতি গুঁড়ো দুধের কারখানা দিবেন। এর জন্য তার খরচ হবে ১,০০০ কোটি টাকা। এই টাকা তিনি ঋণ নিলেন ১০ বছরের জন্য এবং ঋণে সুদের হার মাত্র ১০%। অর্থাৎ, প্রতি বছর তাকে সুদ দিতে হবে ১০০ কোটি টাকা এবং ১০ বছর পরে মূল টাকা।

এবার ধরি, ১ কেজি গুঁড়ো দুধ তিনি উৎপাদন করেন ৪০০ টাকায় এবং বিক্রি করেন ৫০০ টাকায়। অর্থাৎ, কেজিতে তার লাভ হয় ১০০ টাকা। ব্যবসায়ী যদি নিয়মিত সুদ প্রদান করেন, ১০০ কোটি টাকা তুলতে তার প্রতি বছরে কি পরিমাণ গুঁড়ো দুধ বিক্রি করতে হবে?

১ কোটি কেজি। অর্থাৎ, প্রতি বছর গড়ে বিক্রি করতে হবে ১ কোটি কেজি গুঁড়ো দুধ।

ভাবছেন, বাংলাদেশে ১৭ কোটি মানুষ থাকে, মাত্র ১ কোটি মানুষ ১ কেজি করে কিনলেই তো কেল্লাফতে? বাস্তবে হিসেবটা এত সহজ না। ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাংলাদেশে গুঁড়ো দুধের বাজার ছিল ১৪ কোটি ৫০ লাখ কেজি। বাজারের সবগুলো কোম্পানি মিলে এই পরিমাণ বিক্রি করে। সুতরাং, একটা নতুন কোম্পানির জন্য দেশে এসেই ১ কোটি কেজি গুঁড়ো দুধ বিক্রি করা সহজ ব্যাপার না।

কিন্তু কোম্পানি কি শুধু সুদের টাকা ফেরত দিতে ব্যবসা করে? মুনাফা করবে না? অন্যদিকে ১০ বছর শেষে এই কোম্পানিকে একত্রে পুরো আসল বা ১০০০ কোটি টাকা, সুদসহ ফেরত দিতে হবে (মোট ১১০০ কোটি টাকা)। তাহলে সেই বছর তাকে বিক্রি করতে হবে ১১ কোটি কেজি গুঁড়ো দুধ! মানে, বাংলাদেশের প্রায় সব গুঁড়ো দুধ তাকেই বেচতে হবে, নইলে তার কোম্পানি শেষ!

এটা কি আসলে হয়? না, হয় না। আসলে এই 'শিল্পপতি'রা শিল্পিত উপায়ে সুদ ব্যবহার করেন। তারা কখনোই আসল ফেরত দেন না এবং ব্যাংকাররাও আসল কখনোই ফেরত নিতে চান না! শিল্পপতির জন্য শুধু সুদ দিয়ে যাওয়া সহজ এবং সুদের চক্রে শিল্পপতিকে আটকে রাখলে ব্যাংকেরও লাভ।

সুদে-আসলে ঋণ ফেরত দিতে গেলে ব্যবসা একরকম গুটিয়েই ফেলতে হবে, যেহেতু সেই তুলনাই কেবল সুদ দিয়ে ঋণের বোঝা টানতে

থাকলে, বিপত্তিটা ঝেঁটিয়ে দূর করা যাচ্ছে। তাছাড়া সুদে ব্যয় করলে, ট্যাক্সও কম দিতে হয়। সব মিলিয়ে ঋণের বোঝা টেনে টেনে ব্যবসা করতে হবে, এইটাই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হয়ে গেছে। তাই শিল্পপতিরা প্রতি বছর ঋণ নবায়ন করতে থাকে এবং সমান তালে সুদ পরিশোধ করতে থাকে। আসল টাকা কোনকালেই শোধ দিতে যায় না।

জম্বি কোম্পানি

জঙ্গি না, জঙ্গি না, মুদ্রণে ভুল নাই আলহামদুলিল্লাহ...ঠিকই পড়েছেন, 'জম্বি' কোম্পানি! হলিউডের মুভি কিংবা হাল-আমলের বহু গেমস আর ফিকশনের ক্যারেক্টার হচ্ছে 'জম্বি'। মানুষের মতো দেখতে এরা, তবে জীবিত থেকেও মৃত। নড়ে-চড়ে, চলা-ফেরা করে কিন্তু তারা সবাই লাশ। কল্পনার এই জম্বি সাধারণত হয় রোগগ্রস্ত। তারা খায় না, ঘুমায় না, নেই কোন মানবিকতা ও চেতনা। তাহলে, জম্বি কোম্পানি কী?

আমাদের আলোচনার কোনটাই শুধু বইয়ের পাতা আর অর্থনীতিবিদদের খাতায় সীমাবদ্ধ তাত্ত্বিক কচকচি না, বরং চূড়ান্ত বাস্তব এবং সুদভিত্তিক আর্থিক সিস্টেমের মূল ভিত্তি। পদ্ধতিটার প্রতিটা পরতে পরতে আমরা দেখছি, কীভাবে সব মুদ্রা ব্যাংকের হাতে চলে যায়, সুদের ঋণ আকারে আবার সেটা অর্থনীতিতে ফেরত আসে, এরপর আবার, প্রতিনিয়ত সে কোম্পানিগুলোকে দেউলিয়া হতে বাধ্য করে এবং কোম্পানিগুলো দেউলিয়াত্ব পিছাতে গিয়ে শুধুই সুদের ঘানি টেনে চলে।

এই যে কোম্পানিগুলোর 'চমৎকার' ও 'সুচতুর' আইডিয়া যে, সে শুধুই সুদ দিয়ে যাবে আর আসল ফেরত দিবে না, এতে করে কি সে রক্ষা পেল? দুনিয়াতে নতুন এক ধরনের কোম্পানি পাওয়া যাচ্ছে, যারা তাদের ব্যবসায়ের সব লাভ শুধু সুদ প্রদানেই ব্যয় করে থাকে। অর্থাৎ তারা তাদের লাভ আর কোন কাজেই ব্যয় করতে পারে না, শুধুই সুদ গুনতে হয়। একটি অর্থনৈতিক ঝড় আসলেই তারা সব মারা যাবে। দেউলিয়ার দ্বারপ্রান্তে থাকা এই কোম্পানিগুলোকে বলে 'জম্বি কোম্পানি'। অর্থাৎ, জীবন থেকেও মৃত।

নিচের চার্টে লক্ষ্য করুন। আমেরিকার জম্বি কোম্পানির সংখ্যা কিভাবে বেড়ে যাচ্ছে। আপনি ভাবতে পারেন, সময়ের সাথে সবকিছু বাড়ছে জম্বি কোম্পানির সংখ্যাও বাড়তেই পারে। কিন্তু এই চার্টে তা দেখানো হচ্ছে না।

এই চার্টে শতকরা হিসেবে জম্বি কোম্পানির সংখ্যা দেখানো হয়েছে। তার মানে একেবারে মোট কোম্পানির শতকরা হারেই জম্বির সংখ্যা লাগামহীন গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১০]
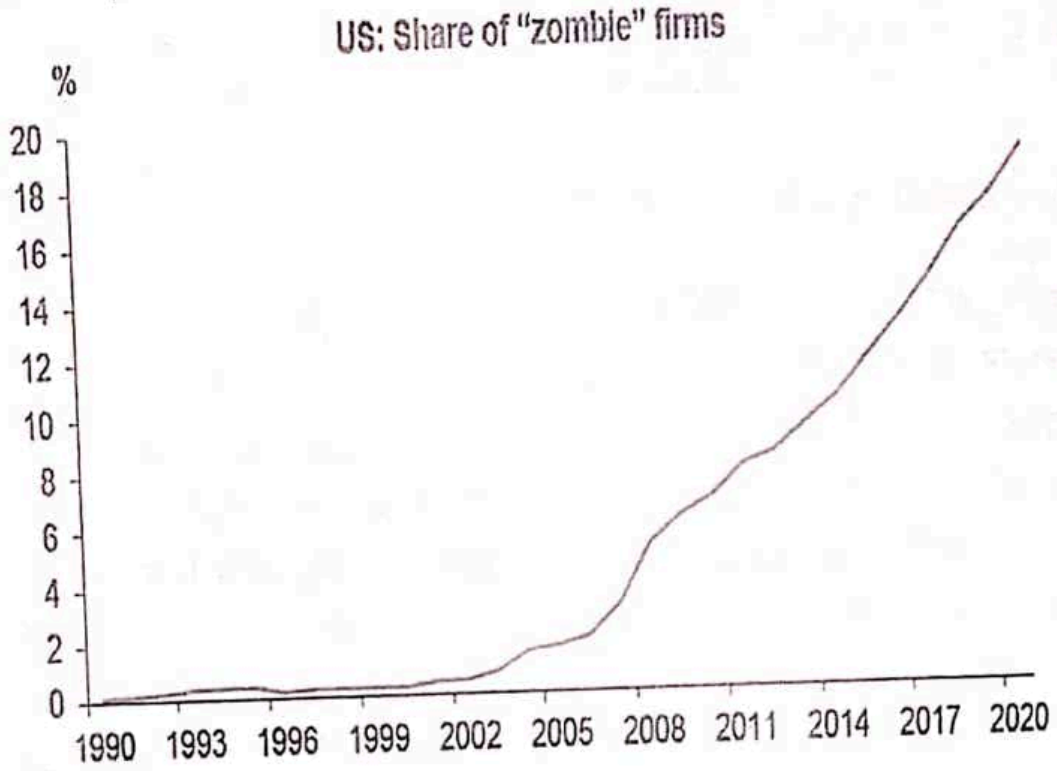
Note: Firm-level data is used to calculate the share of listed firms that are more than ten years old with an interest coverage ratio less than one for three years in a row.

Source: Datastream, Worldscope, DB Global Research

এই সমস্যা কেবল আমেরিকার ভাবলে ভুল হবে। সমস্যাটা পুরো বিশ্বব্যাপী। চারিদিকে জনাব রিবার মতো সম্পদলোভী আর সুদপ্রেমী প্রতিষ্ঠানে ভরা, যাদের অসামান্য শক্তির কুপ্রভাবে জম্বি কোম্পানির সুনামি বয়ে যাচ্ছে পুরো বিশ্বের উপর দিয়ে। এই জম্বি কোম্পানিগুলো একটি অর্থনৈতিক ঝড়ের অপেক্ষায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে, যেই ঝড় এসে তাদের সম্পদ ঋণদাতাদের হাতে তুলে দিবে। বিশ্বের মানি সিস্টেম সত্যিকার অর্থেই সবার জন্য একটা ফাঁদ। সেই ফাঁদের রশি আর প্যাঁচই এতক্ষণ ধরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

---
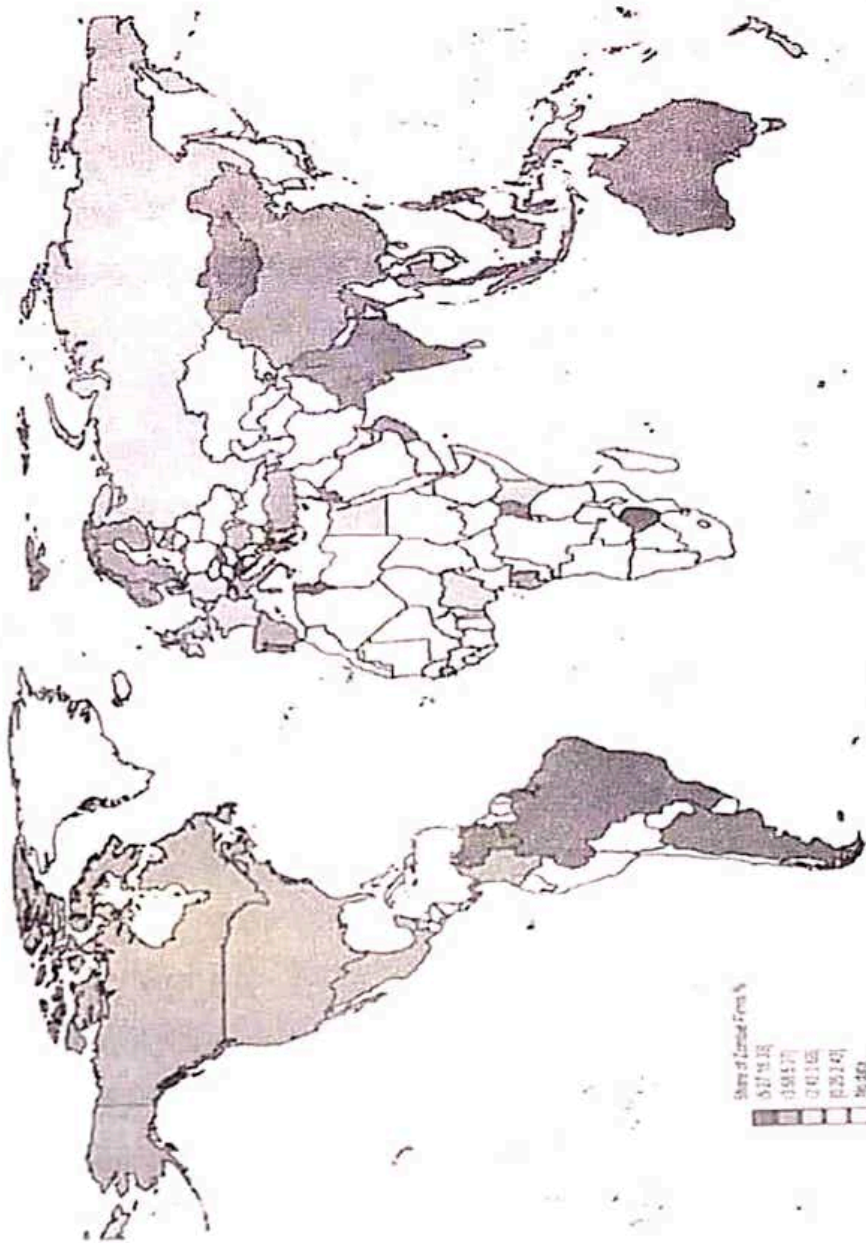
১০ https://www.isabelnet.com/share-of-u-s-zombie-companies/

ছবি - বিশ্বব্যাপী জম্বি কোম্পানির শেয়ার[১১] (সাদা রং করা দেশগুলোর তথ্য অজানা)

১১ Angela De Martiis, Franziska Julia, Peter Thomas Heil (2020). "Are you a Zombie? A Supervised Learning Method to Classify Unviable Firms and Identify the Determinants." Research Gate

আরো গভীরে দেখুন

বর্তমান বিশ্বে আমরা দেখি কেউ দেউলিয়া হলে, ব্যাংক সাধারণত তার সম্পত্তি হাতে নিয়ে দীর্ঘদিন বসে থাকে না। যেহেতু টাকা খাটিয়েই ব্যাংক সুদের ব্যবসা করে, স্থায়ী সম্পত্তি কব্জা করে রাখা তার জন্য ক্ষতিকর। বরং, ব্যাংক বাজারদরে এই সম্পত্তি বিক্রি করে ক্যাশে রূপান্তর করে নেয় এবং সেই ক্যাশ দিয়ে সুদের ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে।

ব্যংক সব সম্পত্তি কব্জা করলে যে সে সকল সম্পত্তির মালিক হয়ে পড়ে, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু ব্যাংক যদি ব্যাংক দেউলিয়া হওয়া ব্যক্তির সম্পত্তি বাজার দরে বিক্রি করে দেয়, তাহলে কী ঘটবে?

১. দেওলিয়া হওয়া সম্পত্তি সমাজের অপর কোনো সদস্য অর্জন করবে এবং বিক্রির টাকাটা ব্যাংকের ঘরে ঢুকবে।
২. এভাবে চলতে থাকলে সমাজে একদল নিঃস্ব এবং একদল সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ তৈরি হবে। এক বাক্যে আমরা বলতে পারি, অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাপকতর হবে।
৩. আমরা বর্তমানে অর্থনীতির এমন একটি পর্যায় নিয়ে আলোচনা করছি, যেখানে প্রতিটি টাকাই ঋণ। এমন পরিবেশে মাত্রাতিরিক্ত সফল না হয়ে থাকলে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য বড় সম্পত্তি কেনার মতো ক্যাশ হাতে থাকবে না। সেজন্য ধনী ব্যক্তিদেরকেও সাধারণত ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সম্পত্তি কিনতে হবে। ব্যাংক এখন কৈ-এর তেলে কৈ ভাজবে। দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ব্যক্তির সম্পত্তি বিক্রি করে যেই টাকা আসার কথা, সেই টাকাই ব্যবসায়ীকে ঋণ হিসেবে দিয়ে দিবে।
৪. জমি কেনার পর শুরু হবে নতুন খেলা। এই জমিকে কাজে লাগিয়ে ব্যবসায়ীকে সুদের হারের চেয়ে অধিক লাভজনকতা ধরে রাখতে হবে। জমি কিনে ফেলে রাখলে কিংবা বিনিয়োগ করার পর লাভজনকতা হারিয়ে ফেললে, তিনিও দেউলিয়া হয়ে যাবেন। প্রতি বছর সুদের হারের থেকে বাড়তি লাভ করলেই কেবল জমি টিকে থাকবে। আর দৌড়ে পিছিয়ে গেলেই সব সম্পত্তি ব্যাংকের পেটে চলে যাবে।

আশা করি, ব্যাপারটি ধরতে পারছেন যে বর্তমান বিশ্বে পুঁজিবাদীরা এক অনন্ত দৌড়ে থাকেন এবং পা ফসকে গেলেই, চলে যান ব্যাংকের পেটে।

'Every time you borrow money, you're robbing your future self.'

– Nathan W. Morris
Writer & personal finance expert

'প্রতিবার ঋণ গ্রহণের সাথে সাথে আপনি নিজ ভবিষ্যৎ থেকেই চুরি করছেন।'

—নাথান মরিস
লেখক ও ব্যক্তিগত অর্থনীতি বিশারদ

'A bank is a place where they lend you an umbrella in fair weather and ask for it back again when it begins to rain.'

– Robert Lee Frost

'প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যাংকগুলো রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে ছাতা ধরে, মেঘলা দিনে তা ফেরত চায়।'

—রবার্ট লী ফ্রস্ট

সবমিলিয়ে সম্পত্তি হাতে আসার পরে, ব্যাংক (বা মহাজন) তা কজায় না রেখে বাজারদরে বিক্রি করে দিলেও, ফলাফলের বিশেষ কোন উন্নতি হবে না। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ কিছু লক্ষ্য করেছেন কি?

এই প্রক্রিয়ায় কোন মুদ্রা সৃষ্টি হচ্ছে না এবং যেই পরিমাণ সুদ হাতে আসার কথা ছিল, তা ঠিকই আসছে। শুধু তাই নয়, বিক্রিত মালের অর্জিত অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পুনরায় সুদে ঋণ হিসেবে অর্থনীতিতে যাচ্ছে এবং সম্পদ চুষে নেবার পূর্ববৎ প্রক্রিয়াটাই চালু আছে। সব মিলিয়ে যা লাউ ছিল, তা জটিল একটি কদুতে পরিণত হয়েছে।

ব্যাংক যে সব সম্পত্তি চুষে নিচ্ছে তার একটি বাস্তব চিত্র লক্ষ করুন।[১২] বর্তমান বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর জিডিপি অপেক্ষা ব্যাংকের মোট সম্পদ (Asset) বেশি।

---

১২ https://www.theglobaleconomy.com/rankings/bank_assets_GDP/

1 Hong Kong 265.16
2 Qatar 232.20
3 China 218.22
4 Denmark 175.28
5 South Korea 174.30
6 Japan 171.21
7 Singapore 168.98
8 Australia 163.47
9 Vietnam 162.76
10 New Zealand 160.54
11 Malaysia 158.92
12 Norway 155.83
13 Sweden 151.46
14 UK 145.88
15 Thailand 144.79
16 France 137.72
17 Brazil 132.07
18 Spain 131.83
19 Mauritius 127.24
20 Jordan 124.61
21 Italy 123.43
22 Portugal 120.02
23 Luxembourg 111.39
24 Iceland 111.02
25 Netherlands 109.60
26 Finland 108.81
27 Nepal 106.15
28 Cape Verde 105.57
29 Austria 104.92

চিত্র - জিডিপির তুলনায় ব্যাংকের মোট সম্পদ - ২০২০

এবার আরেকটু গভীরে দেখুন। ২০১৬ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত, ৪ বছরে আমেরিকাতে দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করেছে ৩১ লাখ ৩২ হাজার ৩৩৮ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান (মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশ)। মাত্র ৪ বছরে 'উন্নত' দেশের ১ শতাংশ মানুষ দেউলিয়া হয়ে গেল, এটা কেমন অর্থনীতি?[১৩]

---

১৩. https://www.uscourts.gov/news/2021/01/28/annual-bankruptcy-filings-fall-297-percent

মার্কিন মুলুকে গত ৪ বছরে বছরপ্রতি দেউলিয়ার সংখ্যা

আপনারা কি বুঝতে পারছেন, সুদের যে ঝড় আমেরিকার ১% নাগরিককে মাত্র চার বছরে ধরাশায়ী করেছে, তা আমাদের জন্য কতটা ভয়াবহ?

আরেকটি ব্যাপার আমরা তাত্ত্বিকভাবে প্রমাণ করেছি, সব অর্থই ব্যাংকের মালিকানায় চলে গেলে সময়ের সাথে দেউলিয়া হবার পরিমাণ কেবল ঊর্ধ্বমুখি হবে।

নিচের চার্টে লক্ষ্য করুন। গড়পড়তা আমেরিকার দেউলিয়ার হার বাড়ছে। এটা ভাবা স্বাভাবিক যে, দিন দিন মানুষ বাড়ছে, তাই মোট দেউলিয়ার পরিমাণ বাড়ছে। কিন্তু, এই চার্ট সেটা দেখাচ্ছে না, এই চার্ট প্রতি হাজারে দেউলিয়া ব্যক্তির সংখ্যাকে নির্দেশ করছে। ১৯০০ সাল থেকে ১৯৩০ সালের দিকে আমেরিকাতে প্রতি হাজারে ০.২ জন বা ০.৩ জন দেউলিয়া হতো বা প্রতি ৫-৬ হাজারে ১ জন দেউলিয়া হত। এমনকি আধুনিক কালের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক মন্দা, ১৯৩০ সালের মহামন্দার সময়েও হাজারে ০.৫ জন ব্যক্তি বা প্রতি ২ হাজারে ১ জন ব্যক্তি দেউলিয়া হয়েছে। সেই তুলনায় গত ত্রিশ বছরে গড়পড়তা দেউলিয়ার হার হচ্ছে হাজারে পাঁচ জন! অর্থাৎ, গত শতাব্দির সবচেয়ে খারাপ সময়ের তুলনায় বর্তমান সময়ে দশ গুণ বেশি মানুষ নিয়মিত দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে! সুদভিত্তিক এই ভয়ংকর অর্থনৈতিক সিস্টেম ও মুদ্রাব্যবস্থা না বদলালে, এই হার শুধু বাড়তেই থাকবে।

Annual U.S. Bankruptcy Filings,
per 1,000 Persons, 1900 - 2013
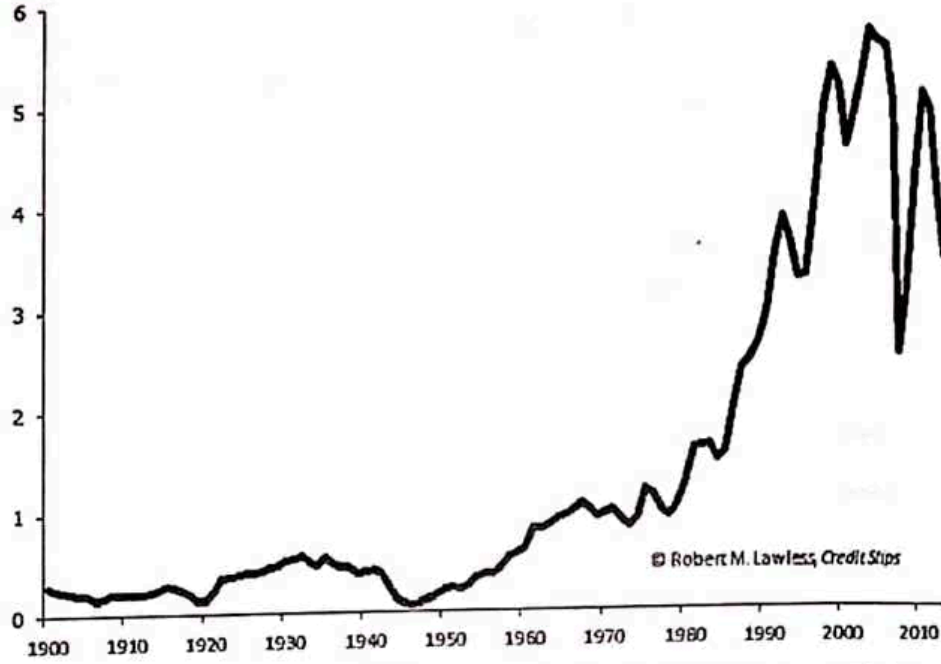
This chart represents the number of total U.S. bankruptcy filings since 1900 per 1,000 persons. The data represent twelve-month intervals ending June 30 of each year, the end of the government's fiscal year historically and the time frame for which early data are available. The first permanent U.S. bankrutpcy law was enacted in 1898. Major changes were adopted in 1938, 1978, and 2005. The chart uses total U.S. bankruptcy filings because of shifting definitions of "consumer" and "business" bankruptcy.[14]

শেষ পরিণতি

সমাজের সবার মুদ্রা ব্যাংকের হাতে চলে গেলে যেমন জীবন বদলে যাবে না, ঠিক তেমনি সকল সম্পত্তি তার হাতে গেলেও সবকিছু বদলে যাবে না।

রূপসাগরের কথাই চিন্তা করি, সেখানে সকল সম্পত্তি রিবা পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের সদস্য মহারাজার হাতে আসলেও যেই ব্যক্তি আগে কৃষক ছিল, সে কৃষিকাজই করবে। কিন্তু জমির মালিক হবে মহারাজা; কৃষক তাকে কেবল খাজনা দিবে। যে ব্যক্তি আগে ব্যবসায়ী ছিল, সে ব্যবসাই করবে। কিন্তু দোকানের মালিক হবে মহারাজা। ব্যবসায়ী তার থেকে দোকান ভাড়া নিয়ে ব্যবসা চালাবে। তেমনি করে সব বাগ-বাগিচা, বাড়ি-ঘর সবকিছুর মালিকও হবে মহারাজা (অনেকটা ব্যক্তি মালিকানাধীন সমাজতন্ত্রের মত)। এভাবে সমাজে মহা রাজার একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হবে, এবং সবাই তাকে খাজনা দিয়ে আগের মতোই জীবিকার অন্বেষণ করতে থাকবে।

---

14. https://www.creditslips.org/creditslips/2013/07/bankruptcy-filing-rate-decline-is-historically-anomalous.html

এই পর্যায়ে এসে মহারাজা কেবলমাত্র সুদ ক্ষমা করে কিন্তু সম্পদের একচ্ছত্র আধিপত্য ধরে রেখে, গল্প শেষ করে দিতে পারে। অথবা সে চাইলে, এখানে গল্প শেষ না করে সুদের চাকা আরো প্রসারিত করতে পারে।

আমরা জানি, মোট ঋণের পরিমাণ মোট মুদ্রার পরিমাণের সমান হলে, সুদাসল পরিশোধ করা গাণিতিকভাবেই অসম্ভব। কিন্তু মুদ্রা ছাড়া মানুষ প্রায় অচল। তাই সব সম্পদ ও মুদ্রা একজনের মালিকানায় যাওয়ার পরও, তার কাছে রূপসাগরবাসী ঋণ নিতে আসতে বাধ্য হবে। এমন অন্তিম পরিস্থিতিতে ঋণের উপর সুদ থাকলে, তা পরিশোধ করা হবে কীভাবে? এবং পরিশোধ না করতে পারলে কী হবে?

প্রথমত, এমন পরিস্থিতিতে ঋণ নেয়ার পরপরই কড়ি ফেরত দেয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা (ভেলার ভেলকির মতোন) শুরু হবে। তবে, অর্থনীতিতে মোট কড়ির সংখ্যা মোট দায় অপেক্ষা কম হওয়ায়, ঋণ পরিশোধ করতে মরিয়া হলেও কিছু মানুষকে দেউলিয়া হতেই হবে। এর থেকে বের হবার কোন উপায় নেই। তাহলে দেউলিয়াত্বের দায় শোধ হবে কী দিয়ে?

মানুষ সকল অর্থ, বিত্ত এবং সম্পত্তি হারিয়ে ফেললেও তার কর্মদক্ষতা থেকে যায়। একে কাজে লাগিয়ে মানুষ আবারো আয় রোজকার করতে পারে এবং সম্পদ জুটাতে পারে। কর্মক্ষমতা হলো সুপ্ত সম্পদ যার বিনিময়ে নিঃস্ব ব্যক্তিও পরিশ্রম করে আয়-রোজকার করতে পারে। লোভী মহাজনের এই সম্পদের উপর নজর পড়বে বৈ কী। দেউলিয়া ব্যক্তির দায় মোট দশটি মোহর হলে এবং তার আয় মাসে ১টি মোহর হলে মহাজন তাকে বলবে, 'সামনের দশ মাস আমার গোলামি খাটো, তাহলে তুমি ঋণের দায় থেকে মুক্তি পাবে।' কোন গৃহিণী দেউলিয়া হলে সেও সেবাদাসী হিসেবে তার সেবা করবে। এভাবে রূপসাগরের সব নাগরিক সময়ে-অসময়ে তার গোলামি করতে থাকবে।

'The issue which has swept down the centuries and which will have to be fought sooner or later is the people versus the banks.'

–Lord Acton

English catholic historian, politician, and writer (1832 - 1902)

'যে সমস্যা শতাব্দীকাল ধরে চলে আসছে এবং যে সমস্যার মোকাবেলা আজ অথবা কাল করতেই হবে তা হচ্ছে আমজনতা বনাম ব্যাংক।'

—লর্ড অ্যাক্টন

ইংরেজ ক্যাথলিক ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ ও লেখক (১৮৩২-১৯০২)

'If the people only understood the rank injustice of our money and banking system, there would be a revolution by morning.'

—Andrew Jackson
7th US President

'মুদ্রাব্যবস্থা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার পুঁতিদুর্গন্ধময় অবিচারটা মানুষ বুঝতে পারলে, কাল সকাল নাগাদ গণআন্দোলন শুরু হয়ে যেত।'

— অ্যান্ড্রু জ্যাকসন
সপ্তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট

শেষ রক্ষা করা যাবে?

এই পর্যন্ত আলোচনা করেছি যে, একটি অর্থনীতিতে প্রতি বছর কিছু নির্দিষ্ট সংখ্যক মুদ্রা প্রবেশ করে থাকলে, তা সুদের পাইপলাইনে সুদি প্রতিষ্ঠানের হাতে চলে যাবে। কিন্তু কোন অর্থনীতিতে মুদ্রার সংখ্যা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকলে (প্রথমে ১০০ মুদ্রা, একটি নির্দিষ্ট সময় পরে ২০০ মুদ্রা, একই সময় পরে ৪০০ মুদ্রা, তারপরে ৮০০ মুদ্রা, ১,৬০০ মুদ্রা, ৩,২০০ মুদ্রা— এভাবে বাড়তে থাকলে), উপরে বর্ণিত ফলাফল থেকে কি বাঁচা সম্ভব?

এক শব্দে প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। চক্রবৃদ্ধি হারে মুদ্রার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, সুদের দ্বারা সকল মুদ্রা কুক্ষিগত হবে না। তাই সবার সুদ দাস হবার ভয় নেই। তাহলে বর্তমান বিশ্বে চক্রবৃদ্ধি হারে মুদ্রার সংখ্যা বাড়াতে পারলেই কি আমরা চিন্তামুক্ত থাকবো? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করছে মুদ্রা কীভাবে তৈরি হচ্ছে, তার উপর।

১. মুদ্রা যখন প্রাকৃতিক

মুদ্রা প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত বস্তু (যেমন সোনা, রূপা, তামা বা সাগর থেকে ভেসে আসা কড়ি) হলে এবং সুদের সাথে পাল্লা দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে (exponentially) অর্থনীতিতে প্রবেশ করতে থাকলে, সাম্যাবস্থা বজায় থাকবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সসীম বিশ্বে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ অসীম পায় না। কিছুদিন চক্রাকারে বেড়ে এক পর্যায়ে সরলসীমায় পৌঁছে যায়।

তাই দিনান্তে, খনি থেকে উত্তোলিত সোনা কিংবা সৈকতে কুড়ানো কড়ি সুদের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না এবং সুদের পাইপলাইনে সবকিছু মহাজনের হাতে কুক্ষিগত হবে।

২. মুদ্রা যখন সরকারি

সরকার নিজে টাকা তৈরি করলে এবং এই টাকা সুদমুক্ত উপায়ে অর্থনীতিতে প্রবেশ করলে, সাম্যাবস্থা বজায় রাখা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় সরকার নিজেই টাকা ছাপাবে এবং সেই টাকা জনগণের কল্যাণে ব্যয় করবে। এভাবে রাষ্ট্রে সবার হাতে হাতে টাকা পৌঁছে যাবে এবং সেই টাকায় সবাই কেনা-বেচা, লেনদেন ও সঞ্চয় করবে। সুদের সাথে পাল্লা দিয়ে চক্রবৃদ্ধি হারে সরকার নতুন টাকা ছাপাতে পারলে, মুদ্রার ভারসাম্য সুদের কারণে নষ্ট হবে না, অর্থাৎ সব টাকা সুদি প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় চলে যাবে না। তবে এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, এমন একটি ভারসাম্য ধরে রাখতে সুদ এবং মুদ্রা বৃদ্ধির হারের সাথে জিডিপির প্রবৃদ্ধিকে সমানতালে আগাতে হবে। অন্যথায় টাকা ছাপানোর ফলে অর্থনীতিতে মাত্রাতিরিক্ত মুদ্রাস্ফীতি শুরু হবে।

৩ মুদ্রা যখন ব্যাংকের হাতে

ব্যাংক নিজেই মুদ্রা তৈরি করে ঋণ দিলে কী হতে পারে তার বিস্তারিত বর্ণনা... আসছে।

বি শে ষ দ্র ষ্ট ব্য

১. সুদ না থাকলে প্রথম দুটি প্রেক্ষাপটে দারুণভাবে মুদ্রাব্যবস্থার সাম্যাবস্থা বজায় থাকবে, কোন বিশেষ কসরত করতে হবে না। কারণ, এই দুটি প্রেক্ষাপটে ভারসাম্য নষ্ট হবার জন্য মুদ্রাব্যবস্থা দায়ী না, দায়ী সুদ।

২. ক্রিপ্টো-মুদ্রা দ্বারাও ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। তবে সরকারি মুদ্রার মতোই এই ভারসাম্য ভালোভাবে ধরে রাখতে পারার শর্ত হচ্ছে, সুদ ও মুদ্রা বৃদ্ধির হারের সাথে জিডিপি প্রবৃদ্ধির সমানতালে আগানো। অন্যথায় তীব্র মূল্যস্ফীতি শুরু হবে। তবে সুদ-চর্চা না থাকলে এই মুদ্রায় ভারসাম্য নষ্ট হবার হবার সম্ভাবনা নেই, সিস্টেমে ন্যায্যতা বজায় থাকলে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অদৃশ্য মুদ্রা

আমরা প্রথমে দেখলাম, কীভাবে সুদের মাধ্যমে সব টাকা সুদ কারবারি বা ব্যাংকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। তার পরবর্তী বিবরণে আমরা দেখলাম, কীভাবে সব সম্পত্তিও একসময় সুদ কারবারির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে যায়।

সুদের চক্র চালাতে থাকলে একজন সব সম্পত্তির মালিক হতে পারবে সত্য। কিন্তু এই ধরনের পরিস্থিতিতে দ্রুত পৌছানোটা ভয়ানক ঝুঁকিপূর্ণ। সত্বর এমনতরো লাভজনক ফায়দা তুলতে চাইলে, দেশে গণ আন্দোলন শুরু হয়ে তার দীর্ঘদিনের জমানো লাভের ফসল বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে এই সিস্টেমে নতুন নতুন ব্যবসায়ী উদ্যোগ কিংবা জনগণের কাজ করার স্পৃহা মরে যায়। তবে এই সবগুলোর চেয়ে বড় ব্যপার হচ্ছে, জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে বিকল্প মুদ্রাব্যবস্থা চালু করে ফেললে, মহাজনের বা ব্যাংকের ক্ষমতার হাতিয়ার হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই একই সাথে অর্থনীতিকে চাঙ্গা রাখার পাশাপাশি মুদ্রাব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব ধরে রাখতে, ব্যাংক বাস্তবসম্মত একটি ফন্দি বের করবে, 'অদৃশ্য মুদ্রা।' অর্থনীতিতে ভার্চুয়াল কারেন্সি বা অদৃশ্য মুদ্রা আনতে পারলেই, উভয় সংকটই কেটে যাবে। প্রথমত, নতুন মুদ্রা প্রবেশ করলে পুরানো ঋণের সুদ প্রদান করার সামর্থ্য তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, মুদ্রা যদি বিনিয়োগ আকারে প্রবেশ করানো হয়, উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। সবশেষে, ব্যাংক নিজেই ভার্চুয়াল মুদ্রা তৈরি করলে মুদ্রাব্যবস্থার উপর তার পূর্ণক্ষমতা অটুট থাকবে।

এই সবকিছু কিভাবে সম্ভব? অদৃশ্য মুদ্রা তৈরির প্রক্রিয়াটি জটিল কিছু না। একজন ব্যক্তি যখন ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে আসবে, কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে অদৃশ্য ব্যালান্স লিখে দিবে। পরবর্তীকালে, ঋণগ্রাহক এ ব্যালান্সকে সাধারণ টাকার মতোই ব্যবহার করবে। এভাবে অর্থনীতিতে অদৃশ্য এবং দৃশ্যমান টাকার সকল তফাৎ দূরীভূত হবে। আর এই টাকা

ব্যাংকের নিজের তৈরি বলে এর মালিকানাও সম্পূর্ণরূপে তার হাতে থাকবে, পাশাপাশি বস্তুগত মুদ্রার (কাগজ-সোনা ইত্যাদি) উপর সকলের নির্ভরশীলতা কমবে এবং অর্থনীতির চাকাও সচল থাকবে।

পুরো সিস্টেমটি কারো কাছে সায়েন্স ফিকশন কিংবা গাঁজাখুরি গল্প বলে মনে হতে পারে। তবে এমনটাই বাস্তব। ভাবছেন হীরক রাজার দেশে আছি আমরা? হীরক রাজার দেশে নাকি ব্যাংক রাজার দেশে আছি সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চলুন হাওয়াই টাকার অধ্যায় শুরু করি।

হাওয়াই টাকা

ভার্চুয়াল কারেন্সি বা হাওয়াই টাকাকে ব্যাংক ক্রেডিট মানিও বলা হয়। বর্তমানে ব্যাংকগুলি সব লেনদেন ডিজিটালি সম্পন্ন করে বিধায় একে অনেকে ইলেকট্রনিক মানিও বলে। আবার ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে ঋণ দেওয়ার ফলে এই টাকা সৃষ্টি হয় বলে, একে Debt Money (বা ঋণ টাকা'ও) বলা হয়ে থাকে। আবার অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলে Broad Money (মোটা টাকা)। বর্তমান বিশ্বে একটি উন্নত দেশের মোট টাকার 'কমপক্ষে' ৯০ শতাংশই এই ব্রড মানি বা হাওয়াই টাকা!

হাওয়াই টাকা বা ব্রড মানি শুধু আধুনিক বিশ্বের একটি আবিষ্কার কিংবা উন্নত প্রযুক্তির কল্যাণেই তৈরি করা সম্ভব হয়েছে ব্যাপারটি এমন নয়। অর্থনীতিবিদ এবং ব্যাংকারদের মধ্যে যারা মুদ্রাব্যবস্থার ইতিহাস সম্পর্কে অসচেতন, তারা শুনলে অবাক হবেন যে হাওয়াই মুদ্রা প্রচলনের কূট-কৌশল বেশ পুরনো। রিচার্ড ভার্নার (Richard Werner) ৫,০০০ বছর আগের ব্যবিলনীয় সভ্যতার ক্লে প্লেটেও হাওয়াই টাকার অনুরূপ ব্যাংকিং লেনদেনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার কথা বলেছেন। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, আপনি চাইলে নিজেও ঘরে বসে হাওয়াই টাকা তৈরি করতে পারবেন।

মূলত দুভাবে হাওয়াই টাকা তৈরি করা যায়।

১. কোন ধরনের ডিপোজিট ব্যতীত এবং
২. সবার কাছ থেকে ডিপোজিট বা টাকা জমা নিয়ে।

প্রথমে আমরা দেখবো কিভাবে ডিপোজিট স্কিম ছাড়াই ক্রেডিট মানি বা হাওয়াই টাকা তৈরি করা যায়। পরবর্তীকালে আমরা দেখবো, কীভাবে ডিপোজিট স্কিম চালু করে আরো সফলভাবে হাওয়াই টাকা উৎপন্ন করা যায়।

এই প্রক্রিয়াটি তুলনামূলক জটিল; তাই সেই আলোচনা একটু পরে করবো। গণিত ভয় পেলে এই অধ্যায়টি বাদ দিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সেক্ষেত্রে জগতের ঢাউস একটি রহস্য আপনার অজানা রয়ে যাবে। তাই কষ্ট করে হলেও প্রাথমিক ধারণা নিয়ে রাখতে পারেন। যাই হোক, চলুন হাতেনাতে দেখাই একেবারে কাঠের সিন্দুক ও সোনার মুদ্রা দিয়ে কীভাবে ঘরে বসে হাওয়াই টাকা তৈরি করা যায়।[১৬]

এক দেশে ছিল এক ব্যাংক...

নাম তার 'মরীচিকা'। সেই মরীচিকা ব্যাংকের মালিক নীলকান্তমণির সাকুল্যে ৪ হাজার মোহর আছে। নিয়মমাফিক সে এই ৪ হাজার মোহর ধার দিবে এবং মেয়াদ শেষে সুদে আসলে ঋণ ফেরত নিবে। কিন্তু নীলকান্তমণি লক্ষ্য করল, ঋণগ্রহীতারা কেউই একবারে সব টাকা তুলে নিচ্ছে না। প্রয়োজন অনুপাতে ধীরে ধীরে ঋণের টাকা তুলে খরচ করছে।

নীলকান্তমণি জহরত সওদাগরকে ৪ হাজার মোহর ঋণ ৪ বছরের জন্য অনুমোদন করে দেখল, সওদাগর সব টাকা একবারে তুলছে না। কারণ জহরত সওদাগর ভেবে দেখলো সব মোহর একসাথে তুলে বাসায় নিয়ে রাখাটা বড় বিপদের কথা। এই টাকা বরং ব্যাংকেই থাকুক, ধীরে ধীরে তুলে নিরাপদে খরচ করতে থাকি। এভাবে প্রতি বছর ১,০০০ মোহর করে তুলে সওদাগর খরচ করতে লাগলো।

এদিকে ব্যাংক দেখলো প্রথম বছরজুড়ে ৩ হাজার মোহর সিন্দুকে অলস পড়ে আছে। ব্যাংক অলস মোহর সহ্য করে না, তাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে সে কাপড় ব্যবসায়ী মণিকে ১,৫০০টি মোহর এবং অলংকার ব্যবসায়ী মুক্তাকে ১,৫০০টি মোহর করে মোট ৩ হাজারটি মোহর ঋণ হিসেবে তিন বছরের জন্য দিয়ে দিল।

দেখুন, মণি ও মুক্তার নামে ৩,০০০টি মোহরের ঋণ অনুমোদন করলে মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৪,০০০ + ৩,০০০ = ৭,০০০টি মোহরে। অথচ সিন্দুকে ছিলই মোটে ৪,০০০টি মোহর।

---

১৬ এই বিদ্যা কোন খারাপ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করার অনুরোধ রইলো। কেবল বর্তমান দুনিয়ার স্বরূপ উন্মোচনের স্বার্থে এই আলোচনা সামনে আনা হয়েছে। এই লেখা থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান কেউ অসদুপায় অবলম্বনের কাজে ব্যবহার করলে দায়ভার সম্পূর্ণ তার।

এদিকে ঋণ অনুমোদনের পরে মণি-মুক্তা নিশ্চয়ই সব মোহর একত্রে তুলে ফেলবে না। তারা তিন বছরে আস্তে-ধীরে এই টাকা খরচ করবে। তাই, ব্যাংক এবার নতুন ২ জন গ্রাহক রুপাই কর্মকার ও সোনাই শিকদারকে পাঁচশ পাঁচশ করে মোট ১ হাজারটি মোহর ১ বছরের জন্য ঋণ দিয়ে দিবে। এভাবে সর্বসাকুল্যে ব্যাংকের প্রদান করা ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮,০০০টি মোহরে। কিন্তু ৪,০০০টি মোহর থেকে ৮,০০০টি মোহর ঋণ দেওয়া সম্ভব হল কীভাবে?

খেয়াল করে দেখুন, ব্যাংক থেকে যারা ঋণ নিয়েছে তাদের সবার মোহর একত্রে এক সিন্দুকেই আছে, তাতে কেউ আপত্তি করছে না। সময়মত পাওনা হাতে পেলেই সবাই সন্তুষ্ট। এই ব্যাপারটা আমাদের সকলের কাছেই যেমন স্পষ্ট, লাভ করার সুযোগ হিসেবে তা সোনার হরিণের মতোই যথেষ্ট।

ছোটবেলায় আমরা পড়েছিলাম, এক দেশে এক কুমিরের ১১টি সন্তান ছিল। সেই কুমির তার ১১টি বাচ্চাকেই শেয়াল পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়াশুনা করতে পাঠায়। কচি কচি কুমিরের বাচ্চা পেয়েতো শেয়াল পণ্ডিত মহা খুশি। রোজ সকালে সে একটি করে বাচ্চা খায় আর মনের সুখে বাকিদের গান শোনায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে প্রতিদিন বিকালে কুমির মা তার সন্তানদের দূর থেকে গুণে যায়। শেয়াল পণ্ডিতও বাধ্য শিক্ষকের মতো গর্তের ভেতর থেকে এক বাচ্চাকেই বার বার বের করে দেখায়। আর কুমির তার ১১টি বাচ্চাই অক্ষত আছে ভেবে খুশি হয়ে ফিরে যায়। এভাবে, সব বাচ্চা খোয়ানোর আগ পর্যন্ত কুমির সন্তুষ্ট থাকে। ব্যাংকের অবস্থা ঠিক শেয়াল পণ্ডিতের মতোই। এক মুদ্রা বার বার দেখানোর কাজে নেমেছে। মোহরের গায়ে নাম লেখা থাকে না বিধায় কোনটা জহরত সওদাগরের বা কোনটা মণি ও মুক্তার তার কোন নির্দিষ্টতা নেই। কেউই বুঝতে পারে না, কার মোহর, কাকে দেখানো হচ্ছে বা ধার দেওয়া হচ্ছে। সবাই দেখে, তাদের মোহর সিন্দুকে নিরাপদে আছে।

তবে কুমিরের গল্পের সাথে ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ একটি পার্থক্য হচ্ছে, ঋণের উপর সুদ আসে বলে সিন্দুকের মোহরে কোন ঘাটতি দেখা দেয় না! আপনার ধারণা ১০০% ভুল যদি আপনি ভেবে থাকেন, বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থা এমনটি করছে না। বর্তমান ব্যবস্থা আরো বড় ধোঁকাবাজি করছে। সেই ঠকবাজি বিষয়ে পাঠ নেয়ার আগে আমাদের হাতের হিসাবটা শেষ করে আসি।

শুরুতে একেবারে সাদাসিধা চিন্তা। ব্যাংক জহরত সওদাগর ছাড়া আর কাউকে ঋণ না দিলে, কী হত?

১. সওদাগর ৪ হাজার মোহর ৪ বছরের জন্য ঋণ নেয়ার পর, প্রথম বছর তুলবে মোট ১ হাজারটি মোহর।
   - বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০টি মোহর
   - সিন্দুকে জমা থাকবে মোট ৩,০০০ + ৪০০ = ৩,৪০০টি মোহর

২. দ্বিতীয় বছর সওদাগর সিন্দুক থেকে তুলবে ১ হাজারটি মোহর।
   - দ্বিতীয় বছর শেষে সওদাগর সুদ দিবে ৪০০টি মোহর।
   - দ্বিতীয় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে (৩,৪০০ — ১,০০০) + ৪০০ (এই বছরের সুদ) = ২,৮০০টি মোহর।

৩. তৃতীয় বছরে সওদাগর সিন্দুক থেকে নিবে ১ হাজারটি মোহর।
   - তৃতীয় বছর শেষে সওদাগর সুদ প্রদান করবে ৪০০টি মোহর।
   - তৃতীয় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে (২,৮০০ — ১,০০০) + ৪০০ (এই বছরের সুদ) = ২,২০০টি মোহর।

৪. চতুর্থ বছরে সিন্দুক থেকে নিবে ১ হাজারটি মোহর।
   - চতুর্থ বছর শেষে সওদাগর সুদ প্রদান করবে ৪০০টি মোহর।
   - চতুর্থ বছর শেষে সওদাগর আসল ফেরত দিলে ব্যাংকের কাছে চলে আসবে মোট ৪,০০০ + ৪০০ + ১,২০০ = ৫,৬০০টি মোহর।

একবারে ৪,০০০টি মোহর তুলে চার বছর পরে একবারে ফেরত দিলেও ৫,৬০০টি মোহরই হত। যেই লাউ সেই কদু।

এবার দেখি, সবাইকে একত্রে ঋণ দিলে, কী ঘটনাটা ঘটে। ব্যাংক একই সাথে সওদাগরকে ৪,০০০টি মোহর ৪ বছরের জন্য, মণি ও মুক্তাকে ৩,০০০টি মোহর ৩ বছরের জন্য এবং রুপাই কর্মকার ও সোনাই শিকদারকে ১,০০০টি মোহর ১ বছরের জন্য ঋণ দিল। প্রশ্ন হচ্ছে, ৪ হাজারটি মোহর দিয়ে কীভাবে ৮ হাজারটি মোহরের অভাব পূরণ করা সম্ভব? সেই অংকটা 'মাত্র' ১০% সরল সুদ ধরে দেখাচ্ছি।

১ম বছর

জহরত সওদাগর তুলবে ১,০০০টি মোহর

দুজন ব্যবসায়ী মণি ও মুক্তা প্রত্যেকে ৫০০টি করে তুলবে মোট ১,০০০টি মোহর

সোনাই কর্মকার ও রুপাই শিকদার এক বছরের জন্য ঋণ নিয়েছিল। তাই তারা সব মোহরই তুলবে। সেটা হল ৫০০টি করে মোট ১,০০০টি মোহর।

সুতরাং, প্রথম বছরের শুরুতে সিন্দুক থেকে তোলা হবে ৩,০০০টি মোহর তাই ব্যাংকের সিন্দুকে বাকি থাকবে ১ হাজারটি মোহর।

- বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০ + ৩০০ + ১০০ = ৮০০টি মোহর
- প্রথম বছর শেষে সোনাই ও রুপাই আসল ফেরত দিলে আসবে ১,০০০টি মোহর
- তাহলে, প্রথম বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে ১,০০০ + ৮০০ (১ম বছরের সুদ) + ১,০০০ (সোনাই+রুপাইের ফেরত দেয়া আসল) = ২,৮০০টি মোহর

২য় বছর

- ২য় বছরে সওদাগর তুলবে ১,০০০টি মোহর এবং মণি ও মুক্তা তুলবে ১,০০০টি মোহর। তাই মোট তোলা হবে ২,০০০টি মোহর
- ২য় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০ + ৩০০ = ৭০০টি মোহর
- তাহলে, ২য় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে
২,৮০০ — ২,০০০ (২য় বছরে তোলা মোহর) + ৭০০ (২য় বছরের সুদ) = ১,৫০০টি মোহর

৩য় বছর

- ৩য় বছরে সবাই তুলবে মোট ২,০০০টি মোহর
- ৩য় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০ + ৩০০ = ৭০০টি মোহর
- ৩য় বছরে মণি-মুক্তা তাদের সুদসহ আসল ৩,০০০টি মোহর ফেরত দিবে
- তাহলে, ৩য় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে

১,৫০০ — ২,০০০ (৩য় বছরে তোলা মোহর) + ৭০০ (৩য় বছরের সুদ) + ৩,০০০ (দুই ব্যবসায়ীর আসল) = ৩,২০০টি মোহর

৪র্থ বছর

- ৪র্থ বছরে কেবল সওদাগর তুলবে ১,০০০টি মোহর
- ৪র্থ বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০টি মোহর
- ৪র্থ বছরে সওদাগর ৪,০০০টি মোহর ফেরত দিবে
- তাহলে, ৪র্থ বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে

৩,২০০-১,০০০ (৪র্থ বছরে তোলা মোহর) + ৪০০ (৪র্থ বছরের সুদ) + ৪,০০০ (দুই সওদাগরের আসল) = ৬,৬০০টি মোহর

দেখা গেল, ব্যাংক ৪,০০০টি মোহরের বিপরীতে ৮,০০০টি মোহর ঋণ দিয়ে এ যাত্রায়ও পার হয়ে গেল। পরেরবারে, কর্তৃপক্ষ ৬,৬০০টি মোহর দিয়ে মোট ১৩,২০০টি মোহর ঋণ দিতে পারবে। এভাবে চলতে থাকবে...

এই হিসাব উপরের ছবির মতন না মিললেও কোন সমস্যা নেই। কোন কারণে সিন্দুকের মোহরে টান পড়লে, তারা সাময়িকভাবে যখন-তখন ঋণ নিতে পারে। কারণ দিন শেষে ব্যাংক ৮ হাজার মোহরের উপর সুদ গ্রহণ করছে, যেখানে পুঁজিই মাত্র ৪ হাজার মোহর।

সূক্ষ্মদর্শী পাঠক হয়তো ইতোমধ্যেই লক্ষ্য করেছেন, তৃতীয় বছরের শুরুতে ব্যাংকের হাতে ছিল ১,৫০০টি মোহর, কিন্তু তারা ঋণ দিয়েছে ২,০০০টি মোহর। এই ধরনের ঝামেলা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। তারা কারো থেকে ক্ষণস্থায়ী ঋণ নিয়েছিল। ৫০০টি মোহর ঋণ এক বছরের জন্য নিলে ৫০টি মোহর সুদে আসল ফেরত দিলেই শেষ। বাকিটা ব্যাংকের লাভ। অর্থাৎ, উপরের হিসেবে ব্যাংকের হাতে মোট ৬,০৫০টি মোহর অবশিষ্ট থাকলে ২০৫০টি মোহর লাভ।

বাজারে সুদের হার ১০ শতাংশের বেশি হলে, ব্যাংক আরো বেশি হাওয়াই মুদ্রা তৈরি করতে পারবে। আর সুদের হার ১০ শতাংশের কম থাকলে, কম হাওয়াই মুদ্রা তৈরি করতে পারবে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সবাই একই সাথে সব মোহর তোলা শুরু করলে ব্যাংককে প্রমাদ গুণতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সবাই একসাথে সবকিছু খরচ করে ফেলে না এবং আরো মজার ব্যপার হচ্ছে মাঝে মাঝে খরচ করা মোহরও ঘুরে ফিরে ব্যাংকেই চলে আসে। এভাবে এই ব্যবস্থা চালু থাকে।

এছাড়াও, সবাই একসাথে এসে তাদের মোহর গণনা করতে চাইলেও ব্যাংক হিসেব দিতে পারবে না। সেই কারণেই সব গ্রাহকের অ্যাকাউন্টের নামে ছোট ছোট সিন্দুক বানালে এবং সেই সিন্দুকগুলোর চাবি নিজ নিজ

অ্যাকাউন্টের মালিকের কাছেই থাকলে, ব্যাংকের দ্বারা হাওয়াই টাকার চক্র চালানোর এবং অবারিত লাভ করার সুযোগ জুটতো না। কিন্তু তারা একটা কুঠুরিতেই সবার মোহর জমা রাখে। এভাবে একই মুদ্রা কয়েকবার ধার দেওয়ায় বাড়তি মুদ্রার জন্ম হয়। এই প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের কাছে মোহর না থাকা সত্ত্বেও, হাওয়াইবাজির মতো তা সৃষ্টি করে এবং মোহর হাতে থাকার মতোই সমান সুযোগ সুবিধা (সুদ) ভোগ করে।

একারণে সিন্দুকের ডালা বন্ধ রাখা বা মোহর গোপন করে রাখা কিন্তু হিসাব উন্মুক্ত রাখাটা ব্যাংকের অস্তিত্বের জন্য অবিচ্ছেদ্য। তবে হ্যাঁ, একমাত্র সুদের কারবারেই এমন কারসাজি করে টাকা তৈরি করা সম্ভব, যা সুদ এবং ব্যবসার মাঝে বিদ্যমান গুরুতর একটি পার্থক্য।

জাদুর হালখাতা

ব্যাংক ঋণ অনুমোদনের সাথে সাথে সুদ গণনা শুরু না করলে, অর্থাৎ, কেবলমাত্র যে পরিমাণ টাকা স্থানান্তর করা হয়েছে তার উপরেই সুদ গণনা করলে, হিসাবটা কেমন হবে?

তা জানার আগে লক্ষ্য করুন, বর্তমানে ব্যাংকে গিয়ে ভল্ট খুলে টাকা গুনে দেখার সুযোগ নেই। তারা সময়মত টাকা দিতে পারলেই, তা আমাদের আস্থা নির্মাণের জন্য যথেষ্ট। তাই কুমির-শিয়ালের গল্পের মতো এক টাকা বার বার দেখানোর প্রয়োজন নেই।

তাহলে আমাদের ঋণ কাঠামোতে মোট দুটি পরিবর্তন আসছে:

১. গ্রাহকের স্থানান্তরিত ঋণ অনুপাতেই কেবল বার্ষিক সুদ আসবে, পুরো অ্যামাউন্টের উপর না এবং
২. ব্যাংক সিন্দুকের ডালা খুলছে না বলে, কোন অলস মোহর সে সিন্দুকে পড়ে থাকতে দিবে না।

সব মিলিয়ে আমরা অন্তরঙ্গভাবে আধুনিক ব্যাংকিং ধারণাগুলোর কাছাকাছি চলে এসেছি।

এবারে হিসাব কষতে বসি। সিন্দুকে মোহর ছিল ৪ হাজারটি। এই সংখ্যার বিপরীতে ব্যাংক ঋণ দিয়েছে ৮ হাজারটি মোহর।

এবার যেহেতু সিন্দুক খোলার প্রয়োজন নেই, ৮ হাজারটি মুদ্রা ঋণ দিয়ে দেবার পরে যদি আরো একজন ব্যবসায়ী হিরা সাহেব এসে দুই বছরের জন্য

২ হাজারটি মোহর ঋণ চায়, ব্যাংক কী করবে? ঋণ নেবার যোগ্য হিরা সাহেবকে বলবে, 'ঠিক আছে কোন সমস্যা নেই।'

পূর্বের মতই ব্যাংক হিরা সাহেবের নামে অ্যাকাউন্ট খুলে ২ হাজারটি মোহর লিখে দিবে। এভাবে ৪,০০০টি মোহরের বিপরীতে ১০,০০০ মোহর তৈরি হয়ে যাবে। কেউ বুঝতে পারবে না, কী হয়েছে।

আগের মতই সিন্দুকে থাকবে ৪,০০০টি মোহর এবং ব্যাংক ঋণ দিবে—

১. জহরত সওদাগরকে ৪,০০০টি মোহর ৪ বছরের জন্য

২. মণি ও মুক্তাকে ৩,০০০টি মোহর ৩ বছরের জন্য

৩. হিরা সাহেবকে ২,০০০টি মোহর ২ বছরের জন্য

৪. সোনাই ও রুপাইকে ১,০০০টি মোহর ১ বছরের জন্য।

প্রথমত, সবাই যে মেয়াদে ঋণ নিয়েছে, মোট ঋণের তত ভাগের ১ ভাগ প্রতি বছর তুলবে। অর্থাৎ সওদাগর তার ঋণ নিয়েছে ৪ বছরের জন্য। সে ১ম বছর মোট ঋণের ৪ ভাগের ১ ভাগ বা ১,০০০টি মোহর তুলবে। এভাবে প্রতি বছর সে ১০০০টি মোহর তুলবে।

দ্বিতীয়ত, গ্রাহক মোহর না তুলে সামনের বছরের জন্য রেখে দিলে, সেটার সুদ তাকে দিতে হবে না।

তৃতীয়ত, সব সুদ সরল হারে দিতে হবে।

সব মিলিয়ে অতীব গ্রাহকবান্ধব বন্দোবস্ত। এবার চলুন জাদুর হালখাতার হিসাবগুলো মেলানো যাক।

১ম বছর

জহরত সওদাগর তুলে নিবে ১,০০০টি মোহর
মণি ও মুক্তা তুলে নিবে ১,০০০টি মোহর
হিরা সাহেব তুলে নিবে ১,০০০টি মোহর
সোনাই ও রুপাই তুলে নিবে ১,০০০টি মোহর

সুতরাং সবাই তুলে নিবে মোট ৪ হাজারটি মোহর আর ব্যাংকের সিন্দুকে কিছু নেই।

- প্রথম বছর সিন্দুক থেকে তোলা হবে ৪,০০০টি মোহর
- প্রথম বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে ৪০০টি মোহর
- সোনাই ও রুপাই আসল ফেরত দেয়ায় ফেরত আসবে ১,০০০টি মোহর

- তাহলে, প্রথম বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে মোট

৪০০ (১ম বছরের সুদ) + ১,০০০ (সোনাই ও রুপাইের ফেরত দেয়া আসল)
= ১,৪০০টি মোহর

২য় বছর

- সওদাগর, মণি-মুক্তা ও হিরা সাহেব ২য় বছরে তুলে নিবে মোট ৩,০০০টি মোহর
- ২য় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে

৩০০ (১ম বছরের সওদাগর, মণি মুক্তা ও হিরা সাহেবের নেয়া মোহরের সুদ)
+ ৩০০ (২য় বছরের তুলে নেয়া মোহরের সুদ)
= ৬০০টি মোহর

- তাহলে, ২য় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে

৬০০ (২য় বছরের পাওয়া মোট সুদ)
+ ২,০০০ (হিরা সাহেবের ফেরত দেয়া আসল)
= ২,৬০০টি মোহর

এখানে, বছরের শুরুতে ব্যাংকের হাতে টান পড়ে। তার কাছে মাত্র ১,৪০০টি মোহর থাকলেও, গ্রাহককে দিতে হয়েছে ৩,০০০টি মোহর। এক্ষেত্রে সুদি প্রতিষ্ঠান সাময়িক সময়ের জন্য নিজেই কারো কাছ থেকে ঋণ নিয়ে বছর শেষে শোধ করে। ব্যাংক নগণ্য সুদে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে বলে হিসেবের সুবিধার জন্য আপাতত সুদের খরচ শূন্য ধরছি।

৩য় বছর

- সওদাগর ও মণি মুক্তা ৩য় বছর তুলে নিবে মোট ২,০০০টি মোহর। সিন্দুকে জমা থাকলো ৬০০টি মোহর।
- জরিকে এক বছরের জন্য ঋণ দিয়ে দিবে ৬০০টি মোহর ।
- ৩য় বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে

২০০ (১ম বছরে সওদাগর ও মণি মুক্তার নেয়া মোহরের সুদ)
+ ২০০ (২য় বছরে সওদাগর ও মণি মুক্তার নেয়া মোহরের সুদ)
+ ২০০ (৩য় বছরে সওদাগর ও মণি মুক্তার নেয়া মোহরের সুদ)
+ ৬০ (জরির দেওয়া সুদ) = ৬৬০টি মোহর

- তাহলে, ৩য় বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে

৬৬০ (৩য় বছরে পাওয়া মোট সুদ)

+ ৩০০০ (মণি ও মুক্তার ফেরত দেয়া আসল)
+ ৬০০ (জরির আসল)
- ১,৬০০ মোহর (ব্যাংকের ঋণ)
= ২,৬৬০টি মোহর

৪র্থ বছর

- সওদাগর তার ৪র্থ বছর তুলে নিবে ১,০০০টি মোহর
- সওদাগরকে ১,০০০টি মোহর দেয়ার পরেও ব্যাংকের কাছে রয়ে গেল ১,৬৬০টি মোহর। এবার সে এই মোহর ১ বছরের জন্য খামারি রত্নাকে ঋণ দিয়ে দিল।
- ৪র্থ বছর শেষে ব্যাংক সুদ পাবে

১০০ (১ম বছরে সওদাগরের মোহরের সুদ)
+ ১০০ (২য় বছরে সওদাগরের নেয়া মোহরের সুদ)
+ ১০০ (৩য় বছরে সওদাগরের নেয়া মোহরের সুদ)
+ ১০০ (৪র্থ বছরে সওদাগরের নেয়া মোহরের সুদ)
+ ১৬৬ (৪র্থ বছরে রত্নার নেয়া মোহরের সুদ)
= ৫৬৬টি মোহর

- তাহলে, ৪র্থ বছর শেষে সিন্দুকে থাকবে

৫৬৬ (৪র্থ বছরের পাওয়া মোট সুদ)
+ ৪,০০০ (জহরত সওদাগরের ফেরত দেয়া আসল)
+ ১,৬৬০ (রত্নার আসল)
= ৬,২২৬টি মোহর

এই হিসাবটা নিতান্তই একটা বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রচেষ্টা। এর আগের মডেলে ৪,০০০টি মোহর খাটিয়ে ব্যাংক লাভ করেছিল ২,০৫০টি মোহর। এই মডেলে ব্যাংক এই ৪ বছরে সব মিলিয়ে সুদ পেয়েছে ২,২২৬টি মোহর, তার কাছে থাকা ৪,০০০টি মোহরের বিপরীতে মোট ১২,২৬০টি মোহর ঋণ দিয়ে।

এর মাঝে ব্যাংক ঋণ নিয়েছিল, যা হিসাবের সুবিধার জন্য সুদমুক্ত ধরে নিয়েছিলাম। সেই ঋণের বিপরীতে ব্যাংক সর্বোচ্চ ১৬০টি মোহর সুদ দিলেও উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন আসতো না। আপনারা নিশ্চয়ই ভাবতে পারেন নিজে ঋণ নিয়ে ব্যাংক কেন অন্যকে ঋণ দিচ্ছে? প্রকৃতপক্ষে, আমাদের নিত্যদিনের হিসেবে এমন ভাবনা আসাটা যৌক্তিক। তবে ব্যাংকের বেলায় এই প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ব্যাংক কম সুদে ঋণ নিয়ে বেশি সুদে ঋণ দিতে পারে। তাই ধার করে ঋণ দেওয়াটাও তার জন্য লাভজনক।

- বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত বাজারে মোট ২,৩৩৬.৭৬ বিলিয়ন টাকার নোট ছেড়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের ব্যাংকগুলো ২০২১ সালে কীভাবে ১১,৪১১.৪৫ বিলিয়ন টাকা ঋণ দিয়েছে?
- ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে ও চালু রাখতে ন্যূনতম ৫০০ টাকা ডিপোজিট রাখতে হয়। ২০২০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট ছিল প্রায় ১৩ কোটি ২৪ লাখ। তাহলে, ন্যূনতম কত টাকা এইসব অ্যাকাউন্টে ছিল আর ব্যাংকগুলো অনায়াসে কত টাকা 'হাওয়াই টাকা' হিসেবে ঋণ দিতে পেরেছিল?

ব্যাংক-টাকার অর্থনৈতিক মেকানিজম

আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে, এভাবে হাওয়াই মুদ্রা সৃষ্টি করতে থাকলে কি ব্যাপক মূল্যস্ফীতি বা হাইপার ইনফ্লেশন হবে না? সংক্ষিপ্ত উত্তর হচ্ছে, না, হবে না। কারণ, এই প্রক্রিয়ায় অর্থনীতিতে স্থায়ী 'মুদ্রা' যোগ না করে, কেবল ঋণের বিপরীতে সাময়িক সময়ের জন্য হাওয়াই টাকা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং পরবর্তীকালে সব ঋণ সুদে আসলে ফেরত নেওয়া হচ্ছে। ঋণ দিলে হাওয়াই টাকা সৃষ্টি হয় বটে। তবে, ঋণ ফেরত নিলে হাওয়াই টাকার মূলভিত্তিটা শূন্যে মিলিয়ে যায় এবং সুদটা রয়ে যায়। তাই হাওয়াই টাকার কারণে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে বড় কোন ক্যাঁচাল হবে না।

হুট করে অস্বাভাবিক পরিমাণে ঋণ বৃদ্ধি করলে মুদ্রাস্ফীতি শুরু হতে পারে। তবে ব্যাংক চাইলেও ঋণের পরিমাণ আকস্মিকভাবে বাড়াতে পারে না। কারণ ঋণগ্রহীতার ঋণ নেবার গ্রহণযোগ্যতা বা ক্রেডিট রেটিং পূর্বেই যাচাই করে নিতে হয় এবং অপাত্রে ঋণ দিলে লোকসান পোহাতে হয়।[১৭] সেজন্য এই প্রক্রিয়াতে হাইপার ইনফ্লেশন হবার সম্ভাবনা সীমিত। অবশ্য,

১৭ আধুনিক অর্থনীতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উদার হস্তে টাকা বিলি করলে মুদ্রাস্ফীতি হবে। তবে এই সমস্যাটিও ক্ষণস্থায়ী হবে। কারণ কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে দান করে না, বরং ঋণ দেয় এবং পরবর্তীতে তা সুদে আসলে ফেরত চায়। আর ঋণ ফেরত আসা মানেই টাকা 'নাই হয়ে যাওয়া'। অর্থাৎ, ক্রমাগত ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে না থাকলে মুল্যস্ফীতি চলমান থাকবে না।

এই প্রক্রিয়ায় ধারাবাহিক মুদ্রাস্ফীতি[১৮] এবং বুম বাস্ট সাইকেল চলতে থাকে। ইতিহাস জুড়ে এমনটিই দেখা গেছে।

অর্থনীতিতে ব্যাংক ঋণের পরিমাণের সমান্তরালে সুদের পরিমাণও বাড়ে। সুদের টাকা ব্যাংকের কাছে আসতেই ব্যাংক পুনরায় তা ঋণ দিয়ে দেয়। এভাবে ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকা অবধি কোন সমস্যা হয় না (কেবল মূল্যস্ফীতি চলতে থাকে)। তবে ঋণ নেওয়ার বেগ কমে আসতেই ঋণ পরিশোধের টাকা জোগাড় নিয়ে হাঙ্গামা লেগে যায়। প্রতিযোগিতায় টিকতে ব্যর্থ হলেই দেউলিয়া। এই দেউলিয়াপনা থেকে রক্ষার উপায়? আরো অধিক ঋণ গ্রহণ!!

'Thus, our national circulating medium is now at the mercy of loan transactions of banks, which lend, not money, but promises to supply money they do not possess.'

–Irving Fisher
American neoclassical economist, statistician & inventor

'অর্থাৎ আমাদের জাতীয় মুদ্রা সরবরাহ ব্যাংকের ঋণপ্রবাহের দয়ার উপর নির্ভরশীল। যারা (ব্যাংক) প্রকৃতপক্ষে কোন টাকা দেয় না, বরং এমন টাকা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় যা তাদের নিজেদের কাছেও নেই।'

— আরভিন ফিশার
আমেরিকার বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, পরিসংখ্যানবিদ এবং উদ্ভাবক

'I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies.'

– Thomas Jefferson
Founding Father & 3rd President of the USA

'আমি বিশ্বাস করি আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশী সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপদজনক হচ্ছে ব্যাংকব্যবস্থা।'

– থমাস জেফারসন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও ৩য় প্রেসিডেন্ট

'If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered.

Thomas Jefferson (1743-1826)
Founding Father & 3rd President of the USA

---

১৮ ধারাবাহিক মুদ্রাস্ফীতি এবং হাইপার ইনফ্লেশন এক বিষয় নয়।

'আমেরিকানরা বেসরকারি ব্যাংকগুলোকে দেশের টাকা ছাপানোর ক্ষমতা দিলে, জনগণকে আষ্টেপৃষ্ঠে গড়ে উঠা ব্যাংক ও তাদের দোসররা মিলে প্রথমে মূল্যস্ফীতি এবং তারপরে মূল্যহ্রাস করে জনগণের সব সম্পদ হাতিয়ে নিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সন্তানরা পূর্বপুরুষদের জয় করা ভূমিতেই গৃহহীন হয়ে না পড়ে।'

—থমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬)
মার্কিন জাতির প্রতিষ্ঠাতাদের একজন ও তৃতীয় প্রেসিডেন্ট

সমাজ ব্যবস্থা

পিছন ফিরে তাকালে দেখতে পাবো, আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে কী বিশাল দূরত্ব পাড়ি দিয়ে এসেছি। শুরুতে মুদ্রার সংখ্যা ছিল ধ্রুব, সমাজ ছিল বৈষম্যহীন এবং অর্থনীতির আকৃতি ছিল স্থির।

এই বাধাগুলো তুলে দিয়ে আমরা বৈষম্যময় ও প্রবৃদ্ধির অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছি। তারপর মুদ্রাব্যবস্থার স্থিরতার শর্ত তুলে দিয়ে ক্রমবর্ধমান মুদ্রাব্যবস্থার সূচনা করেছি। এরপরে সংযুক্ত করা হয়েছে চক্রবৃদ্ধি সুদ। সবশেষে, মুদ্রা তৈরির নির্দিষ্ট সীমারেখাও তুলে নিয়েছি। এভাবে কাঠামোটি বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার নিকটবর্তী হয়েছে। কিন্তু ক্রেডিট মানি আবিষ্কারের ফলে অর্থনীতিতে কী কী পরিবর্তন এসেছে? ধরা যাক, রামিম ব্যাংকই ক্রেডিট মানি এনেছে। এখন কী কী পরিবর্তন আসবে, তা ভালো ভাবে জানতে রূপসাগরের বুক চষে বেড়ানো যাক।

নতুন মুদ্রা তৈরির মাধ্যমে রামিম ব্যাংক অত্যন্ত ব্যবসাবান্ধব একটি প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। কেউ ব্যবসায় বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে ঋণ নিতে আসলে, কর্তৃপক্ষ সহজে তাকে ফিরিয়ে দেয় না। দ্বীপে আর কারো কাছে খুঁজে মুদ্রা পাওয়া যাক বা না যাক বিপদের দিনে ব্যাংকের কাছে গেলে মুদ্রা পাওয়া যাবেই। এভাবে ব্যাংক নিজেকে সব ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তিদের সাহায্য প্রাপ্তির শেষ স্থল হিসেবেও ব্যাংক সবার কাছে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছে। সব মিলিয়ে ব্যাংক অর্থনৈতিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র।

সবাইকে 'সাহায্য' করতে পেরে ব্যাংকও বেজায় খুশি। কারণ, সবার ঋণ গ্রহণের সমানতালে ব্যাংকের লাভ আকাশছোঁয়া হচ্ছে। তাছাড়া, টাকা এখন হাওয়া থেকেও আসে বলে নতুন টাকা সৃষ্টি করে ধার দেওয়া কোন সমস্যাই না। বরং নতুন ঋণ, নতুন টাকা সৃষ্টির দরজা খুলে দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানের জন্য।

নতুন টাকা সৃষ্টি করাতে সবার হাতে হাতে আগের চেয়ে বেশি বেশি টাকা আসছে — ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য ঋণ পরিশোধ করা এখন আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। কারণ, সবার হাতে বেশি বেশি টাকা আসা মানে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির হাতেও বেশি টাকা আসা। তবে সবচেয়ে লাভবান হচ্ছে বিনিয়োগকারীরা। তারা নতুন কোন প্রকল্প হাতে নিতেই ব্যাংক থেকে সরাসরি টাকা পাচ্ছে। আগের মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পুঁজি সংগ্রহ করতে হচ্ছে না। ব্যাংকের কাছে অনেক টাকা থাকে দেখে ব্যাংক নিজেও ঋণ দিতে ইচ্ছুক। ঋণের সহজলভ্যতার ফলে সবাই বিনিয়োগে উৎসাহিত হচ্ছে এবং অভিনব সব ব্যবসার উদ্যোগ তৈরি হচ্ছে। অধিক পরিমাণ বিনিয়োগের ফলে চারদিকে বইছে উন্নয়নের সুবাতাস।

এদিকে, সবকিছুর দাম বাড়তি থাকায় সাধারণ মানুষ সামান্য চাপের মুখে থাকলেও তাদের জমি, ঘর-বাড়ি, কৃষিপণ্য ইত্যাদির দাম বাড়তি থাকায় তারা আরেকদিক দিয়ে বেশ উৎফুল্লও। স্বাবলম্বী একটি সমাজে আসলে কেউই নিঃস্ব না, প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু সম্পদ রয়েছে বিধায় সবাই এখন আগের তুলনায় নিজেকে ধনী অনুভব করছে।

সবকিছুতে চাঙ্গাভাবের প্রভাবে চারপাশে দর্শনীয় উন্নয়নের ছড়াছড়ি। সহজ শর্তে ঋণ জোটায় আনকোরা উদ্যোগ নিতে কেউই দুবার ভাবছে না। সর্বত্রই নজরে পড়ে বিরামহীন খোঁড়াখুঁড়ি এবং অবকাঠামো নির্মাণের চিহ্ন। যত্রতত্র বিনিয়োগ করে লাভ হাতিয়ে নেওয়ার ধান্ধায় ব্যস্ত সমাজ। বন উজাড় করে অভিনব ব্যবসায়ী উদ্যোগ, কৃষিপণ্য নিয়ে ব্যবসা, শিক্ষা কেনাবেচা চলছে অবিরাম। এককথায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যবসায়িক চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্যণীয়।

অধিক মুদ্রাপ্রবাহ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারে নিত্যপণ্যের মূল্য যেন আকাশ ছুঁইছুঁই। চাকরি বা ব্যবসা ব্যতীত ভালোভাবে চলতে নাভিশ্বাস উঠে যাচ্ছে। ফুরিয়েছে অতীতের সেই কৃষিনির্ভর, নিজের কাজ নিজে করে খাওয়ার দিন। মুদ্রার একপাশে সফল সমাজ বিনিয়োগ করে রাতারাতি অসম্ভব ধনী হয়ে যাচ্ছে, অন্যপাশে ভুখানাঙ্গাদের দল সর্বস্ব হারিয়ে গৃহহীন, ভূমিহীনে রূপান্তরিত হচ্ছে। সোনালিযুগের সেই শান্ত-স্নিগ্ধ কৃষিভিত্তিক জীবন আজ নিরুদ্দিষ্ট। জাদুর কাঠিতে যেন সকলই বদলেছে।

এবারে বিষয়গুলো ব্যাংকের আঙ্গিক থেকে মূল্যায়ন করা যাক। ব্যাংক তার ঋণ ব্যবসার, নতুন মুদ্রা সৃষ্টির এবং নতুন মুদ্রায় ব্যাংকের ব্যবসা বৃদ্ধির সর্বপ্রকার কলাকৌশল ওতপ্রোতভাবে জানে। নতুন মুদ্রা কেবল ব্যাংকের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনেনি। এপর্যায়ে দ্বীপবাসীর জন্যও তা অপরিহার্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কারণ, নতুন মুদ্রা সরবরাহের অনুপস্থিতিতে পুরনো ঋণের সুদের চাপে তারা প্রতিনিয়ত দেউলিয়া হতে থাকবে। ব্যাংক

চাইলেই মুদ্রা সৃষ্টি বন্ধ করে দিতে পারে। কিন্তু তা ব্যাংক ও জনগণ উভয়ের জন্যই অশুভ। উত্তম পন্থা হলো চলমান উন্নয়নের ধারা বজায় রাখা। এটা সবার জন্য মঙ্গলকর। তাই ব্যাংক ঋণগ্রহণে সবাইকে ব্যাপক উৎসাহ দেয়। আমজনতাও ঋণ নিতে অনুপ্রাণিত হচ্ছে। 'উন্নতি' কে না চায়!

এদিকে, সফল বিনিয়োগ করে অনেকে বিপুল সম্পদশালী হয়েছে। আবার, একই সময়ে কিছু ব্যক্তি সর্বস্বান্তও হয়ে গেছে। সব হারানোর দল চাকরিজীবী হিসেবে শিল্পপতির অধীনে নিযুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। ফলে চাকরিদাতা এবং চাকরিপ্রার্থীর বিকাশ ঘটেছে। আগের স্বাবলম্বী দিন আর নাই। এ সমাজে সবাই নিজেকে চাকরিদাতা হিসেবে গড়তে চান, কিন্তু অধিকাংশই চাকরিপ্রার্থী হিসেবে জীবন পার করে দেন। সামাজিক অবস্থার প্রভাবে সবাই কেবল ধনী হবার স্বপ্নেই বিভোর। যেই সোনার নেশায় রিবা এককালে সুদি ব্যবসার সূচনা করে, সেই আসক্তি এখন সবার মাঝে বিরাজমান। মুদ্রার প্রতি অন্ধ ভালবাসাই সমাজের বড় ব্যাধি। বাতাসে ভাসছে স্বার্থ ও পুঁজিবাদের তীব্র গন্ধ। হারিয়েছে আগের সেসব স্বর্ণালি দিন। অর্থকড়ি বিহীন মানুষ মূল্যহীন, তাকে কেউ চিনে না। সবাই বুঝে নিজ স্বার্থ এবং সর্বত্র নিজের সুবিধাটাই মুখ্য। অথচ সর্বজনীন পরিশ্রমের লাভের গুড় আপসেই চলে যাচ্ছে ব্যাংকের ঘরে।

সরকার

সহজ ঋণ ও বিনিয়োগের কল্যাণে চতুর্দিকে পরিবর্তনের ছোঁয়া। তবে একটি সমস্যা। অপরিকল্পিত ও বিশৃঙ্খল উন্নয়নের ঠাঁটে ধ্বংস হয়েছে দ্বীপের গাছপালা, খেলার মাঠ ও বিশুদ্ধ পানির উৎস। আগের পায়ে হাঁটার পথে মালবাহী ভারী যানবাহন চলছে।

এই বর্ধিত কলেবরের অর্থনীতি ও কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য এই মুহূর্তে প্রয়োজন সঠিক নির্দেশনা এবং নির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য একটা সরকার। তাই সর্বজননীন পরামর্শক্রমে প্রতিষ্ঠিত হল দ্বীপ সরকার।

সরকার সবার থেকে চাঁদা (ট্যাক্স) নিয়ে দ্বীপের অবকাঠামো, যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থাকে উন্নত করবে, যেন আরো ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি হয় ও নতুন নতুন বিনিয়োগ হয়।

দ্বীপে উন্নয়নবান্ধব সরকার আসাটা ব্যাংকের জন্যে বি-রা-ট সুসংবাদ। বেশি বেশি ব্যবসার প্রসার এবং বিনিয়োগ হলে ব্যাংক খুশি। তদুপরি, এখন থেকে ব্যাংক সরকারকেও ঋণ দেবে এবং সরকার জনগণের ট্যাক্সের টাকা

তুলে পই পই করে এই ঋণ সুদসমেত পরিশোধ করবে। যত উন্নয়ন, তত ঋণ। আবার যত ঋণ, তত উন্নয়ন। সব মিলিয়ে সরকার উন্নয়নের জপমালা টিপছে এবং সরকারের দেখাদেখি বাকিরাও তাল দিতে শুরু করেছে। এইটা ছাড়া টিকে থাকার যে কোন উপায়ই নেই।

সরকার আসার আরেকটি সুবিধা। এখন মহাজনকে ব্যক্তিগত লাঠিয়াল বাহিনী ব্যবহার করে ঋণখেলাপিকে শায়েস্তা করতে হয় না। সরকার নিজ দায়িত্বে আইনি প্রক্রিয়ায় সেই বন্দোবস্ত করে দেয়। আবার একই সাথে ব্যাংককে নিজ টাকায় প্রহরী রেখে নিরাপত্তা নিতে হয় না। সরকারের পুলিশ বাহিনী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তা দেয়। ব্যাংকের জন্য সরকার রীতিমতো আশীর্বাদস্বরূপ। একদিকে জনগণের টাকায় ব্যাংক ধনী হচ্ছে, আবার তাদের ট্যাক্সের টাকাতেই নিরাপত্তা লাভ করছে। ব্যাংকও সবাইকে বুঝাচ্ছে, 'আমাকে ছাড়া তোমরা অচল।' তাই অর্থনৈতিক বৈষম্যে ক্ষুব্ধ হয়ে জনগণ ব্যাংকের উপর আক্রমণ করতে গেলে, জনগণের সরকারই তা প্রতিহত করছে। সব মিলিয়ে দ্বীপ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে ব্যাংকের জন্য কাজ করার আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং সামাজিক মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকছে।

অর্থনৈতিক মন্দা ও বেইল আউট

বিনিয়োগের বৃদ্ধির ধারা চিরকাল অব্যাহত রাখতে পারলে, চমৎকার হয়। কিন্তু, বিনিয়োগ বৃদ্ধির একটি সীমারেখা আছে যেই পর্যায়ের পরে এই বৃদ্ধির হার কমে আসে। কিন্তু বিনিয়োগ বাড়াতে ব্যর্থ হলে, নতুন টাকা (ঋণ) তৈরি হবে না এবং নতুন টাকা তৈরি না হলে, পুরানো ঋণের সুদ খেলাপির হার বাড়বে। ফলে, অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেবে।

অর্থনীতিতে নতুন টাকার প্রবেশ করানোই মন্দা বা মহামন্দা থেকে বের হবার সবচেয়ে কার্যকরী উপায়। ব্যাংক ছিটিয়ে ছিটিয়ে টাকা দান করে না, বিধায় নতুন টাকা সরবরাহ নিশ্চিতে শেষতক ঋণের পরিমাণই বৃদ্ধি করতে হবে। এই ঋণগুলোকে কেবল বিনিয়োগ আকারে আসতে হবে, এমন কোন শর্ত নেই। বেশি মানুষকে ঋণের আওতাভুক্ত করতে ব্যাংক তখন গৃহঋণ, কৃষিঋণ, শিক্ষাঋণ ইত্যাদি কৌশল বাজারে ছাড়তে শুরু করবে। অর্থনৈতিক সার্বিক পরিস্থিতিতে এই ঋণগ্রহণ ব্যতীত কেউই ভালো থাকবে না। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের ঋণের আওতাভুক্ত

করতে [illegible] enterprise) স্কিম চালু করবে।

নতুন স্কিম দেখে অধিবাসীরা প্রথমে ইতস্তত বোধ করতে পারে। এই জড়তা দূর করতে ব্যাংক ঋণ পণ্যের শক্তিশালী প্রচার করবে, এজেন্ট নিয়োগ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠাবে। জনতার বিশ্বাস ও ভালবাসা অর্জনকারী সমাজের গুরুত্বপূর্ণ মানুষদেরকে সেসব বিজ্ঞাপনের মডেল বানাবে। আবার ইতোমধ্যেই যারা ধনী হয়ে আরামদায়ক জীবনযাপন করছে তাদের দেখাদেখি সবাই সেই জীবনের খোয়াব দেখবে। সেই স্বপ্ন পূরণ করতে ঋণ নিবে।

এতদিন মানুষ উন্নয়ন দেখেছিল কেবল আশেপাশে। এখন উন্নয়নের ধারা ঘরে ঘরে ঢুকে পড়েছে। মানুষ নয়া অট্টালিকা নির্মাণে মশগুল, দেদার ঋণ গৃহস্থালি পণ্যেও। সবখানে উন্নতির ছোঁয়া। এলাকার সেরা ভবন অচিরেই লজ্জার, দুর্বলতার স্মারক হয়ে উঠছে।

তবুও, ঋণে জর্জরিত হওয়ার একটা সীমা আছে। প্রতিবারই অর্থনীতি সেই খাদের কিনারায় পৌঁছানোর আগেই ব্যাংক একটা না একটা উপায় বের করে। ব্যাংক চায় সবাই ভালো থাকুক। আর সুদের এই অর্থনীতিতে সবার ভালো থাকার জন্য প্রয়োজন আরো অধিক ঋণ নেয়া। এবার নতুন এই সীমানা অতিক্রম করতে তারা ভোক্তা ঋণ নামক আরেকটা নতুন পণ্য নিয়ে আনবে। মানুষ এখন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, এমনকি মুদি দোকানের কেনাকাটা পর্যন্ত ব্যাংক ঋণে করতে পারবে এবং তা মুদ্রায় না করে ক্রেডিট খাতার মাধ্যমে করতে পারবে।

দ্বীপের খোলনলচে বদলে গেছে। কীভাবে সব বদলালো, কেন বদলাল— কেউ জানার সময় পেল না। তবে সবাই একটি কথা মেনে নিয়েছে, ঋণ ছাড়া চলা অসম্ভব। আরো একটা বাস্তবতা মাথাচাড়া দিয়েছে। দ্বীপবাসী আগের তুলনায় অকল্পনীয় উন্নত জীবনযাপন করলেও পুরানো স্বাধীন, বৈষম্যহীন সেই সমাজকে সাম্প্রতিক রঙচঙে এই ডামাডোলের মাঝে পথের কোথায় যেন তারা খুইয়ে বসেছে। সব অধিবাসীই যেন জান্তব শক্তিশালী কিছু প্রতিষ্ঠানের হাতে জিম্মি। সমাজের এই পুরো আঙ্গিকটাকে আমরা মনোহারি এক পরিভাষায় বলি 'আধুনিক (সুদভিত্তিক) পুঁজিবাদ'।

'Someone has to borrow every dollar we have in circulation, cash or credit. If the banks create ample synthetic money we are prosperous; if not, we starve. We are absolutely without a permanent money system. When one gets a complete grasp of the picture, the tragic absurdity of our hopeless position is almost incredible, but there it is. It is the most

important subject intelligent persons can investigate and reflect upon. It is so important that our present civilization may collapse unless it becomes widely understood and the defects remedied very soon.'

–Robert H Hemphill
Credit Manager of Federal Reserve Bank of Atlanta, 1934

'রাষ্ট্রের প্রতিটি পয়সাই কোন না কোন ব্যক্তিকে ঋণ নিতে হবে, ক্যাশ কিংবা ক্রেডিট হিসেবে। আমাদের স্বচ্ছলতা ব্যাংক কর্তৃক বিপুল পরিমাণ ভেলকি মুদ্রা তৈরির উপরে নির্ভরশীল, অন্যথায়, দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। অর্থাৎ, আমাদের একটা স্থায়ী মুদ্রাব্যবস্থা বলতে কিছুই নেই।
পুরো ব্যাপারটা ধরতে পারলে একজন বুঝবে যে, আমাদের বর্তমান দশাটা কতটা অবিশ্বাস্যরকম নাজুক এবং হতাশাজনক। কিন্তু এটাই সত্য। বুদ্ধিমান ব্যক্তির চিন্তা ও গবেষণা করার জন্য এটিই একটি মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ জাতিগতভাবে এই অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপারটা বুঝতে না পারলে এবং এর সমাধানে ব্যর্থ হলে বর্তমান সভ্যতার পতন অবশ্যম্ভাবী।'

—রবার্ট হেম্ফিল
ক্রেডিট ম্যানেজার, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অফ আটলান্টা ১৯৩৪

'Money is a new form of slavery, and distinguishable from the old simply by the fact that it is impersonal — that there is no human relation between master and slave.'

–Leo Tolstoy
Legendary Russian Writer

'দাসত্বের নতুন রূপই অর্থ। তবে, সেকালে মালিকের সাথে দাসের ব্যক্তিগত একটি সম্পর্ক ছিল, এখন আর সেই সম্পর্ক নেই। ওটুকুই তফাৎ।'

—লিও তলস্তয়
জগদ্বিখ্যাত রুশ লেখক

'None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free.'

–Johann W. Goethe
Legendary german poet, playwright, novelist, scientist & statesman

'মিথ্যা স্বাধীনতার জাঁকজমকে নিমজ্জিত ব্যক্তির চেয়ে বড় দাস কেউ হতে পারে না।'

—জোয়ান ডব্লিও গ্যটে
বিখ্যাত জার্মান কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, বিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ

বিভিন্ন প্রকার অর্থ ব্যবস্থা

আমরা সচক্ষে দেখলাম, পটে আঁকা ছবির মতো নিরিবিলি একটি দ্বীপে কিছু ব্যক্তির ঐচ্ছিক লেনদেনের মধ্য দিয়ে সুদের চারা রোপন শুরু হয়ে, কীভাবে মহীরুহের মতো সমাজ ও ব্যক্তি জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার ফল প্রবেশ করল। সমস্ত বর্ণনা পড়ে মনে হতে পারে যে, এই বইয়ে আধুনিক বিশ্বের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সুদভিত্তিক অর্থনীতি এই দুটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কিন্তু খেয়াল করলে বুঝবেন, এখানে সতর্কভাবেই প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রসঙ্গগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা দেখানো হয়নি যে, দ্বীপে আগে ঘোড়ার গাড়ি চলতো, এখন চলছে ইঞ্জিনের গাড়ি। এমন বলা হয়নি যে অধিবাসীরা লোহার ব্যবহার শিখেছে, বিদ্যুৎ সংযোগ এনেছে, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ডিজিটাল কারেন্সি ইত্যাদি তৈরি করেছে কিংবা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছে।

এক কথায়, প্রযুক্তিগত দিক থেকে সব আগের মতোই আছে। এসেছে শুধুই সুদভিত্তিক অর্থনীতি আর সেই অর্থনীতিকে চালাতে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো। এটাও ধরে নিতে পারেন, ব্যাংকের দেয়া 'মানি রিসিপ্ট' আসলে তালপাতার উপর কয়লার কালিতে লেখা পত্র। একারণেই 'আধুনিক' পুঁজিবাদের সাথে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কোনো সংযোগ নেই। এটি নিতান্তই সুদভিত্তিক অর্থনীতির সুন্দর একটি অপর নাম।

আরেকটা কথা জরুরি, সুদভিত্তিক অর্থনীতির বিরোধিতা মানে সমাজতন্ত্রের সমর্থন করা না। বর্তমান পুঁজিবাদ এবং সমাজবাদের মাঝে আমাদের চিন্তা আটকে গেছে দেখে অনেকসময় আমরা একটি বাক্সের বাইরে যেতে পারছি না। চিন্তা করে বলুন তো, সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামল কি পুঁজিবাদী না সমাজবাদী ছিল? এই প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। কারণ, এই দুইয়ের বাইরেও জগত আছে।

অনেকে আবার ভুল করে মন্তব্য করে ফেলতে পারে যে, ইসলামী অর্থনীতি মানেও পুঁজিবাদ। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তমান পুঁজিবাদের বিরোধিতা করা মানে ইসলামেরও বিরোধিতা করা। দাবিটা একেবারেই সঠিক না। পড়াশোনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেষ্টা করুন, আবু বকর রা:-এর শাসনামল কি পুঁজিবাদী ছিল? তখন মানুষের জীবন কি কিছু মুষ্টিমেয় কিছু মহাজনের হাতে কব্জা ছিল? শ্রেণিবৈষম্য এবং অর্থনৈতিক শোষণে ভরা ছিল?

সবশেষে, বর্তমান পুঁজিবাদের ভুল ধরিয়ে দেওয়া মানেই মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানার বিরোধিতা করা না। মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং ব্যক্তি মালিকানার বিকাশ অবশ্যই প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমরা

মুক্তবাজার, লেসে ফেয়ার অর্থনীতি এবং সুদ একত্রে চাল ডালের মতো মিশিয়ে এই খিচুড়ির নাম দিয়েছি পুঁজিবাদ। ফলে আমাদের সমীকরণটি দাঁড়িয়েছে নিম্নরূপ :

উন্মুক্ত বাজার + ব্যক্তি মালিকানা + সুদ = আধুনিক পুঁজিবাদ

উপরের সমীকরণ থেকে সুদকে বাদ দিলে আমরা পাব সুদমুক্ত বাজার-অর্থনীতি। তখন সমীকরণটি দাঁড়াবে নিম্নরূপ :

উন্মুক্ত বাজার + ব্যক্তি মালিকানা = বাজার-অর্থনীতি (বা সুদ মুক্ত পুঁজিবাদ) / Market Economy

প্রথম সমীকরণের সাথে করভিত্তিক সমাজকল্যাণ যুক্ত করলে আমরা পাব কল্যাণ অর্থনীতি :

উন্মুক্ত বাজার + ব্যক্তি মালিকানা + সুদ + সমাজকল্যাণ (করভিত্তিক) = কল্যাণ অর্থনীতি

এবার দ্বিতীয় সমীকরণের বাম পাশে জাকাত এবং অনুদানভিত্তিক সমাজ কল্যাণ যুক্ত করে দিলে আমরা ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা পাব

উন্মুক্ত বাজার + ব্যক্তি মালিকানা + সমাজকল্যাণ (জাকাত এবং অনুদান) = ইসলামী অর্থনীতি

অর্থাৎ, ইসলাম মানে বর্তমানের এই সুদভিত্তিক বৈষম্য উৎপাদনকারী পুঁজিবাদ এই অপবাদটি নিতান্তই ভ্রান্ত । ইসলাম উৎসাহ দেয় সঠিক মুদ্রাব্যবস্থার ভিত্তিতে সুদমুক্ত বিনিয়োগ দ্বারা পরিচালিত মুক্তবাজার অর্থনীতি, যেখানে রয়েছে ব্যাপক সমাজকল্যাণ (জাকাত এবং অনুদান)।

চিন্তার খোরাক—

- ব্যাংক ছাড়া একটি রাষ্ট্র কি কোনদিন চলতে পারবে?
- ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমাধান কেমন হওয়া উচিত?

'Sound money and free banking are not impossible, they are merely illegal.'

–Hans F. Sennholz
American-Austrian economist & author

'ন্যায্য মুদ্রা এবং মুক্ত-ব্যাংকিং ব্যবস্থা অসম্ভব নয়, বরং এটি এক প্রকার নিষিদ্ধ।'

—হ্যান্স এফ. সেনহোলজ
আমেরিকান-অস্ট্রিয়ান অর্থনীতিবিদ ও লেখক

সপ্তম অধ্যায়

চেকের প্রবর্তন

এই পর্যন্ত আমরা হাবুডুবু খাচ্ছিলাম একেবারে কাঠের তক্তা আর সিন্দুকের যুগে, যেখানে সবাই হাতেহাতে লেনদেন সম্পন্ন করত— না ছিল কোন চেকের ব্যবহার, না ছিল ডিপোজিট স্কিম বা কাগুজে মুদ্রা। এবার চলুন ক্রমে ক্রমে সেই প্রযুক্তিগত উন্নয়নগুলো ঘটাই।

আমরা আমাদের চিন্তার বাঁধগুলো (সেটিরাস পেরিবাস) একটি একটি করে দূর করে সমাজ জীবনে ব্যাংক এবং সুদের প্রভাব দেখেছি? এবার আমরা দেখবো ব্যাংকিং খাতে অভিনব প্রযুক্তির কল্যাণে কী কী পরিবর্তন সংগঠিত হয়।

প্রথমেই ব্যাংকিং সেক্টরের যুগান্তকারী আবিষ্কার চেকে লেনদেন দিয়ে শুরু করা যাক। চেকের মাধ্যমে লেনদেনব্যবস্থায় স্বাক্ষর করেই মুদ্রার মালিকানা পরিবর্তন করা যায়, সেক্ষেত্রে হাতে হাতে অর্থ লেনদেন অদরকারী। ৯ম শতাব্দীর দিকে চীনে সর্বপ্রথম চেকের ব্যবহার শুরু হয়। বাণিজ্যখাতে চেকে লেনদেন অত্যন্ত সুবিধাজনক দেখে এর ব্যবহার ধীরে ধীরে ইয়োরোপে এবং পরবর্তীকালে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

চেকে লেনদেন করলে গ্রাহকদের ঝামেলা বহুলাংশে কমে। এর আরেকটি উপকার হল লেনদেনের শক্তিশালী নিরাপত্তা। চেক লিখে দিলে নিজের সাথে টাকা বহন করে চলতে হয় না। অ্যাকাউন্টের হিসাব পরিবর্তনের মাধ্যমে চোখের নিমিষে লেনদেন সম্পন্ন হয়।

এবারে ব্যাংকারদের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখা যাক। প্রথমত, চেক ব্যবস্থা ব্যাংকের জন্যও লাভজনক। কারণ চেকে লেনদেন করলে ব্যাংকের ভেতরেই এক অ্যাকাউন্ট থেকে আরেক অ্যাকাউন্টে মুদ্রা চালান হয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, সিন্দুকের মুদ্রা সিন্দুকেই পড়ে থাকে, কেবল হিসাব খাতায় নামের বিপরীতে নাম্বার বদলায়।

চেক ব্যবহারে একজন ব্যাংকারের জন্য সবচেয়ে বড় উপকার হচ্ছে, ঋণগ্রাহকেরা টাকা তুলতে আসে না। সেই ফাঁকে, মহাজন নিরাপদে অদৃশ্য টাকার উপর সুদ অর্জন করতে থাকে। এভাবে ব্যাংক আরো বেশি পরিমাণে হাওয়াই/ অদৃশ্য মুদ্রা তৈরি করতে পারে।

এই প্রভাবগুলো সুস্পষ্ট করতে হৃদয়নগর রাজ্য ভ্রমণ করে আসা যাক।

হৃদয়নগর রাজ্যটির অর্থনীতি সবদিক থেকে রূপসাগরের মতোই। একটিই মাত্র ভিন্নতা। হৃদয়নগরে চেক আছে, যা রূপসাগরে নেই। অর্থাৎ, এই পর্যন্ত আলোচনা করা অর্থনৈতিক কাঠামোর সবটাই হৃদয়নগরে আছে এবং তার সাথে যুক্ত করা হয়েছে একটি মাত্র ব্যাংকিং প্রযুক্তি, চেক। চেক মধ্য যুগের আবিষ্কার হওয়ায় আমরা ধরে নেই হৃদয়নগরের মুদ্রা হচ্ছে সোনার মোহর।

হৃদয়নগরে 'মায়া' নামে একজন তরুণ ব্যাংকার বসবাস করে। ব্যবসার শুরুতে তার পুঁজি ছিল ১,০০০টি মুদ্রা। কিছুদিন বাদে মায়ার কাছে প্রেমকুমার ২,০০০টি মুদ্রা এবং সোহাগ ১,০০০টি মুদ্রার ঋণ চাইল। মায়া হাওয়াই টাকার হিসাব বুঝে। তাই সে গ্রাহকের চাহিদা অনুযায়ী প্রেমকুমারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ২,০০০টি মুদ্রা এবং সোহাগ ব্যাপারির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ১,০০০টি মুদ্রা জমা (ডেপজিট) লিখে দিল। এভাবে মাত্র ১,০০০টি মুদ্রার বিপরীতে মোট ৩,০০০টি (২,০০০ +১,০০০) মুদ্রা ঋণ দেওয়া হয়ে গেল।

ঋণের টাকা অ্যাকাউন্টে জমাসাপেক্ষে প্রেমকুমার দোকান তৈরির কাজে নেমে পড়লো। প্রথমে সে গ্রামের গৃহস্থ প্রীতির কাছ থেকে ১,০০০টি মুদ্রার কাঠ কিনল। হাতে মাল বুঝে পেয়ে প্রেমকুমার প্রীতিকে বলল, 'আপনি কোন চিন্তা করবেন না দিদি, আমার ছেলে পরাণ কালকেই আপনাদের বাড়িতে গিয়ে সব টাকা দিয়ে আসবে।' প্রীতি বলল, 'বাড়ি থেকে যদি টাকা চুরি হয়ে যায়? গ্রামে তো হতচ্ছাড়া চোর ডাকাতের অভাব নাই। তাছাড়া এতোগুলো টাকা একসাথে দেখলে ভালো মানুষও খারাপ হতে কতক্ষণ? আপনি বরং একটি চেক লিখে টাকাটা আমার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিন। আমার জন্য ভালো, আপনার জন্যও ভালো।' প্রীতির কথায় প্রেমকুমার বরং সন্তুষ্টই হলো। কারণ সে নিজেও সিন্দুক থেকে টাকা তুলে পৌছে দেয়ার মতো ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক।

এদিকে চেক হাতে পেয়ে ব্যাংক প্রীতির অ্যাকাউন্টে ১,০০০টি মুদ্রা জমা লিখে দিল এবং প্রেম-কুমারের অ্যাকাউন্ট থেকে ১,০০০টি মুদ্রা বিয়োগ করে দিল। আর সিন্দুকের ১,০০০টি মুদ্রা জায়গাতেই পড়ে রইল। একবার ডালা খুলবারও প্রয়োজন পড়ল না।

কিছুদিন পরে সোহাগ ব্যাপারি প্রীতির কাছ থেকে ৫০০টি মুদ্রার ধান নিলো। সেও ব্যাংক চেক পাঠিয়ে দিল। মায়া সেই মোতাবেক সোহাগ ব্যাপারির অ্যাকাউন্ট থেকে ৫০০টি মোহর বিয়োগ করে প্রীতির অ্যাকাউন্টে ৫০০টি মোহর যোগ করে দিল। এদিকে হাতে টাকা পেয়ে নতুন একটি ঘর নির্মাণ কাজে মনোযোগ দিল প্রীতি। সেই নিমিত্তে বাজারের ব্যবসায়ী আদরের কাছ থেকে সে মোট ৩০০টি মুদ্রার ছন, পাটি ও আসবাবপত্র কিনে রাখলো। এই লেনদেনও প্রীতি চেকের বিনিময়ে করে নিল।

এখন ব্যাংকে তাদের হিসেব দাঁড়াবে এমন—

আদরের অ্যাকাউন্টের বিপরীতে জমা আছে ৩০০টি মোহর এবং কোন ঋণ নেই

প্রীতির অ্যাকাউন্টের বিপরীতে জমা আছে ১,২০০টি মোহর (১,০০০+৫০০-৩০০) এবং কোন ঋণ নেই

প্রেমকুমারের অ্যাকাউন্টের বিপরীতে মোট ঋণ ২,০০০টি মোহর (খরচ হয়েছে ১,০০০টি মোহর এবং জমা আছে ১,০০০টি মোহর)

সোহাগ ব্যাপারির অ্যাকাউন্টের বিপরীতে মোট ঋণ ১,০০০টি মোহর (খরচ হয়েছে ৫০০টি মোহর এবং জমা আছে ৫০০টি মোহর)

এখন পর্যন্ত সিন্দুকের ডালা খোলা লাগেনি অথচ বছর শেষে আসছে প্রচুর পরিমাণ সুদ। এই হলো চেকের ম্যাজিক।

অনেকে বলতে পারেন সিন্দুকের মোহর যেহেতু নাড়ানোই লাগেনি কিছু মুদ্রা চুপিসারে আরো কতক ব্যক্তিকে যেমন— দরদী, মমতা কিংবা ননাইকে দিয়ে দিলেই তো হয়। তাত্ত্বিকভাবে তা সম্ভব হলেও জরুরি প্রয়োজনের জন্য কিছু মোহর সিন্দুকে রাখা উচিত। রাজ্যে শতভাগই ক্যাশবিহীন লেনদেন হয় না। তাই সরাসরি লেনদেনের লক্ষে কিছু মুদ্রা উত্তোলিত হয়। আর ভবিষ্যতে অ্যাকাউন্টবিহীন কারো সাথে লেনদেন করতে গেলেও তা চেকে অসম্ভব। এরূপ কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্বর্ণমুদ্রা ব্যবহার করতেই হবে এবং সিন্দুকের মোহরের চাহিদাও থাকবে। তাই জরুরি সোনার অনুপস্থিতিতে বিপদের দিনে ব্যাংককেই পরের কাছে ঋণের জন্য হাত পাততে হবে। পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে গ্রাহকদের 'পরে আসেন' বলে ফিরিয়ে দিতে হবে। বার বার এমন করলে গ্রাহকদের সন্দেহ বাড়বে এবং তারা সিন্দুকের সব সোনা তুলতে আসবে। তখন ব্যাংকের সূক্ষ্ম হিসাবব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। তাই আপদকালীন সময় সামাল দিতে জরুরি ভিত্তিতে কিছু মুদ্রা জমা রাখা বাধ্যতামূলক।

রাজ্যে সবার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকলে এবং চেকে লেনদেন করলে, ক্যাশলেস অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হত এবং এই গল্প ছবির মতোই মিলে যেত। মায়াও নিশ্চিন্তে ঋণ বাড়াতে থাকত এবং সুদ তুলতো। কিন্তু আমরা যেহেতু এখনো আমাদের কল্পিত কাঠামোটি মধ্যযুগে রেখেছি, রাজ্যে কেবল বড় বড় ব্যবসায়ীরা চেকে লেনদেন করবে এবং ছোট লেনদেন সব মোহরে হবে, এমনটিই ধরে নেওয়া উত্তম।

টিকা - ব্যাংকের কারসাজি

ইস্ট পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংকে ১০০ কোটি রুপি আছে। আর এর পুরোটাই ব্যাংকের নিজের মূলধন। সে এখনো কোন ব্যক্তির কাছ থেকে 'ডিপোজিট' নেয়া শুরু করেনি। এখন, দেখা গেল আদমজী জুট মিল আর চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি উভয়েই ১০০ কোটি রুপি করে ঋণ চেয়েছে।

ব্যাংক ২ জনকেই ১০০ কোটি করে মোট ২০০ কোটি রুপি ঋণ দিল। সে সাথে শর্ত দিল যে, ঋণগ্রহীতা ঋণের রুপি যাদের কাছে ব্যয় করবে, তাদের ইস্ট পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে।

এবার দেখা গেল, এই দুই প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩০০ সহযোগী সংস্থার কাছ থেকে পণ্য ও সেবা কিনবে, তারা সবাই এই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করবে। আর ঋণ নেয়া সংস্থা এই নতুন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে চেকে লেনদেন করবে।

এতে করে দেখা যাবে, রুপির একটা বড় অংশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেই থেকে যাচ্ছে, আর বাইরে থেকে স্রেফ চেক বদলের মাধ্যমে রুপির মালিকানা পরিবর্তন হচ্ছে।

এবার ব্যাংক বলল যে আপনারা আপনাদের কর্মকর্তার বেতন 'স্যালারি অ্যাকাউন্ট' এর মাধ্যমে দেয়া শুরু করুন। তখন, আদমজী জুট মিল আর চট্টগ্রাম বন্দরের সব কর্মকর্তাসহ বাকি আরো ৩০০ সংস্থার বেশিরভাগ কর্মকর্তা, ধরলাম প্রায় ৭০০ জনের স্যালারি তাদের নতুন অ্যাকাউন্টের বিপরীতে আসা শুরু করল। সবাই তাদের জমা করা রুপির ১০% অ্যাকাউন্টে রেখে দিলেও, ব্যাংকের কাছে একটা মোটা অংকের রুপি জমা থাকে।

ঋণগ্রাহকদের হিসাব মতে, ব্যাংকের কাছে আছে মোট ২০০ কোটি রুপি। কিন্তু ভল্ট তালাবদ্ধ বলে রহস্যময় টাকার অংকের স্বরূপটা কেউ বুঝতে পারছে না। তারা এই ঋণের টাকা খরচ করলে, ঘুরেফিরে তা

একজনের অ্যাকাউন্ট থেকে আরেকজনের অ্যাকাউন্টে যায়। আর চেকে নিজেদের মধ্যে লেনদেন করলে, ভল্টের মুদ্রা ভল্টেই পড়ে থাকে, কেবল হিসাব খাতায় নাম এবং নাম্বার বদলায়। সবাই মনে করছে, প্রত্যেকের রুপি ভল্টে নিরাপদে আছে। প্রকৃতপক্ষে, তাদেরকে হিসাব দেখানো হচ্ছে ২০০ কোটি রুপির, ভল্টে কখনোই এত মুদ্রা ছিল না।

এখানে, ব্যাংক তার মূলধনের মাত্র ২ গুণ ঋণ দিয়েছে। অথচ, বর্তমান বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মূলধনের ৮ থেকে ২০ গুণ ঋণ পর্যন্ত দিয়ে থাকে এবং এই অনুপাত দিন দিন কেবল বেড়েই চলেছে। সোয়া তিন শত বছর আগে ১৬৯৪ সালে, ইংল্যান্ডে এই ব্যবস্থা আইনগতভাবে অনুমোদন দেওয়া হয়। তখন এই অনুপাত ছিল ২ গুণ যা ক্রমাগত বাড়াতে বাড়াতে পৃথিবীতে কিছু দেশে এখন ৫০ গুণে গিয়ে ঠেকেছে। আর ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার এবং ক্যাশলেস ইকনোমির যুগে তো এই অনুপাতের প্রাসঙ্গিকতাই হারিয়ে যাচ্ছে ।

ডিপোজিট ব্যাংকিং

আগেকার আমলে সবার বাসায় সিন্দুক থাকত। বাসায় সিন্দুক না থাকলে, তারা মেঝে, কলসি কিংবা কুয়াতে মোহর রেখে দিত যাতে ডাকাতের হাতে না পড়ে। এমতাবস্থায়, ব্যাংক সেই মূল্যবান সম্পদ 'গচ্ছিত' রাখার দায়িত্ব নিলে কি সবার জন্য সুবিধা না? আচ্ছা, ব্যাংক এত ঝুঁকি কেন নিতে গেল? কারণ, ব্যাংক হচ্ছে সাধারণের ধরাছোঁয়া ও বোধগম্যতার বাইরে অবস্থানকারী অদৃশ্য এক ভয়ানক সম্পদ লুটেরা!

চলুন শুনি, সেই অদৃশ্য ঠগী ব্যাংকের নিজের দায়িত্বে অপরের টাকা রাখার 'লাভ' আর 'লোভ' এর কাহিনিটা।

স্বপন মিয়া স্বনামধন্য এক সওদাগর। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে তিনি সোনা-গহনা-হিরে-জহরত জোগাড় করে আনেন। ঘরে ডাকাতের হামলা থেকে বাঁচতে নিরাপত্তার স্বার্থে, তিনি সব সম্পদ ব্যাংকে জমা রাখলেন। ব্যাংক ম্যানেজার স্বপন মিয়ার নামে একটা 'অ্যাকাউন্ট' খুলে এই সার্টিফিকেট দিল যে, 'স্বপন সাহেবের এই পরিমাণ সম্পদ আমাদের নিকট জমা আছে। তিনি ইচ্ছামাফিক তা তুলে নিতে পারবেন।'

এরপর থেকে দরকার পড়লেই স্বপন সাহেব ব্যাংকে গিয়ে প্রয়োজনমাফিক মোহর তুলে আনেন এবং আয় করলেও তা ব্যাংকে জমা করেন। এভাবে সুখে শান্তিতে তিনি দিন পার করেন। স্বাভাবিকভাবেই,

আপনি আপনার মোহর কোথাও রাখলে এবং যেকোন প্রয়োজনের মুহূর্তে খরচ করতে পারলে, কোন আপত্তি করবেন না। এদিকে অন্যরা যা-ই করুক, অলস মোহর ব্যাংকের জন্য অসহনীয়। টাকায় টাকা বানানো যে প্রতিষ্ঠানের পেশা, অলস টাকা পড়ে থাকতে দেখলে সে নিজের হাত কামড়াবে এবং যেকোন মূল্যে তা কাজে লাগাতে চাইবে!

দেখা গেল কিছুদিন বাদে, এলাকার জমিদার গ্রামের সবার জন্য একটি দীঘি খনন করতে ব্যাংকের থেকে ঋণ চাইল। ব্যাংক আলগোছে সিন্দুকের মোহরগুলো ঋণ দিয়ে দিল। পরিবর্তনটা লক্ষ্য করেছেন? সিন্দুকের মুদ্রার মালিক কিন্তু ব্যাংক না। এটা স্বপন সাহেবসহ আরো যেসব গ্রাহক 'নিরাপদে জমা' রেখেছিলেন তাদের সম্পদ। এখন ব্যাংক সেই টাকাই ঋণ দিয়ে তার উপর সুদ নিচ্ছে। এভাবে বছর শেষে সুদে-আসলে বাড়তি মোহর ব্যাংক নিজের পকেটে ভরে ফেলল! ১০ হাজার মোহর ঋণ দশ শতাংশ সুদে দিলে বিনা পুঁজিতেই এক বছরে নতুন ১,০০০ মোহরের মালিক হয়ে গেল ব্যাংক! এভাবেই ডিপোজিট স্কিম ব্যাংকিং খাতে আরেকটি যুগপৎ পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। এই পরিবর্তনগুলো অনুধাবনের স্বার্থে চলুন, আমরা আমাদের জ্ঞানের তরী নিদ্রাসাগরের তীরে ভিড়াই।

গতবার ধরে নিয়েছিলাম, হৃদয়নগর অবিকল রূপসাগরের মতন, পার্থক্য কেবল চেকে। এবারে চেকের কথা ভুলে যান। কারণ, আমরা এখন চলে যাচ্ছি নতুন একটি দ্বীপে। এই দ্বীপের নাম জীবনসাগর। এখানে কোন চেক নেই, সবাই হাতে হাতে মোহর লেনদেন করে। জীবনসাগর দ্বীপটি রূপসাগরের আদর্শ প্রতিলিপি, পার্থক্য একটাই— ডিপোজিট স্কিম। রূপসাগর কিংবা হৃদয়নগরে ব্যাংকে কোন কিছু সঞ্চয় করে রাখা যেত না। সবাই ব্যাংক থেকে কেবল ঋণ নিত। জীবনসাগরে সম্পদ জমা করা এবং ঋণ নেওয়া দুইটাই করা যায়। শুধু এই-ই পার্থক্য।

যাই হোক, আপণ নামে এক তরুণ উদ্যোক্তার স্বপ্ন হলো, সে সুদের ব্যবসা করবে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সে পুঁজিশূন্য। তার আছে কেবলমাত্র একটি লোহার সিন্দুক। লোহার সিন্দুক দিয়ে সুদের ব্যবসা চালনার বুদ্ধি আঁটতে আঁটতে তার মাথায় দুর্দান্ত একটা ধারণা খেলে গেল।

পরদিন সকাল থেকে সে দ্বীপের সবার কাছে গিয়ে গিয়ে বলতে লাগলো, 'শুনুন প্রিয় দ্বীপবাসী, আর কত দিন মেঝে, কলসি কিংবা কুয়াতে মোহর রেখে দুঃশ্চিন্তায় দিন পার করবেন? এই যে দেখুন, আমার কাছে কত সুন্দর এবং নিরাপদ একটি লোহার সিন্দুক আছে। আপনাদের যে কারো বাসায় টাকা রাখার চেয়ে এখানে রাখা বহুগুণে নিরাপদ। আজ থেকে আপনারা সবাই নিজ নিজ মুদ্রা আমার সিন্দুকে জমা রাখতে পারেন। এর বিনিময়ে

আমাকে কিছুই দিতে হবে না। আমি বিনা মূল্যে এই সেবা প্রদান করছি এবং ক্ষয়ক্ষতির দায়ভারও নিচ্ছি।'

দ্বীপবাসীর কাছে এই প্রস্তাব চমৎকার লাগলো। তাই সবাই নিজ মুদ্রা রাখার ঘরে রাখার মতো অনিরাপদ কাজ না করে, বরং লোহার সিন্দুককেই বেছে নিয়ে প্রয়োজনমাফিক সেখান থেকে তুলে তুলে ব্যয় করার সিদ্ধান্ত নিল।

এভাবে জীবনসাগর দ্বীপে চমকপ্রদ একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হল, যেখানে অধিবাসীরা তাদের সম্পদ নিরাপদে রাখতে পারে। আপণ এই কাজটি নিপুণতা ও সততার সাথে করছে বিধায় কিছুদিনের মধ্যেই দেখা যাবে, ঘরের আলমারির ড্রয়ারের মতো দ্বীপের অধিবাসীরাও সিন্দুকে মুদ্রা জমা রাখবে। প্রয়োজনবোধে সেখান থেকে তুলে নিবে। আলমারিতে টাকা রাখার এবং খরচ করার মাঝে যেমন কিছু মুদ্রা অলস পড়ে থাকে, ঠিক তেমনি করে সিন্দুকে কিছু মোহর অলস পড়ে থাকবে। এই অলস পড়ে থাকা মোহরই হচ্ছে আপণের মূলধন।

ধরা যাক, আপণের সিন্দুকে গড়পড়তা ১,০০০টি মুদ্রা অলস পড়ে থাকে। ১০০টি মুদ্রা জরুরি জমা রেখে সে বাকি ৯০০টি মুদ্রা ঋণ দিয়ে ফি-বছর সুদ পেতে থাকবে (আপাতত হাওয়াই মুদ্রার ব্যাপারটা আমলে নিলাম না)। এভাবে আপণের আয়-রোজকারের মোক্ষম এক ব্যবস্থা হবে।

মুদ্রা সবসময় একজনের হাত থেকে অপর কারো হাতে প্রবেশ করে। তাই কারো ব্যয় হওয়া মানে কারো আয় হওয়া। আপণের থেকে ৯০০টি মুদ্রা ঋণ নেয়া ব্যক্তি ঋণের টাকা খরচ করলে, তা জীবনসাগরের মাঝেই ঘুরপাক খেতে থাকবে। সদ্যই আয়কারী ব্যক্তি তার বাসায় এই মুদ্রা রাখার চেয়ে সিন্দুকে রাখা নিরাপদবোধে, আপণের কাছে জমা রাখবেন। অর্থাৎ, ঘুরে-ফিরে সব মুদ্রা আপণের সিন্দুকেই ফিরে আসবে।

৯০০টি মুদ্রা পুনরায় জমা হয়ে সিন্দুকে মোট মুদ্রা আবারো ১০০০টি হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ, সিন্দুক থেকে বের হওয়া মুদ্রা হাত ঘুরে আগের জায়গাতেই ফিরে আসলো এবং মাঝখান দিয়ে সুদ অর্জিত হলো।

লক্ষ্য করুন, মুদ্রা সিন্দুকে ফের জমা হওয়া মানেই কিন্তু ঋণ পরিশোধ হওয়া নয়। ঋণগ্রহীতা ব্যক্তি এখনো ঋণীই আছেন। সোনার মুদ্রা কেবল হাত বদল করেছে এবং নতুন কিছু সদস্যের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাদের নামে সিন্দুকে মুদ্রা জমা পড়ছে। তাই একই সাথে সিন্দুক থাকছে ভরা এবং সুদ আসছে চড়া।[১৯]

---

১৯ দ্বীপের সবার ঋণ এবং আয় উভয়ই বেড়ে গেছে। এক কথায় এইটা হচ্ছে বর্তমান সময়ের "উন্নয়ন" এর চিত্র। আশা করি, এই উদাহরণ পড়ে উন্নয়নের শুভঙ্করের ফাঁকিটা আপনারা বুঝতে পারছেন।

বিক্রয়যোগ্য পণ্য হাতে থাকলে সবাই যা করে, আপণও তাই করবে। আবারো ঋণ দিয়ে দিবে। তবে এবার ৯০০টি মুদ্রা ঋণ দিবে না। কারণ আগে মোট ডিপোজিট ছিল ১,০০০টি মুদ্রা কিন্তু এখন মোট ডিপোজিট ১,৯০০টি মুদ্রা! সবাই যদি একসাথে মুদ্রা তুলতে আসে, আপণের লেজে-গোবরে অবস্থা হবে। তাই সিন্দুকের অলস মুদ্রা পুনরায় ঋণ দেবার জন্য আপণ বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করবে। যেহেতু প্রথমবার ১,০০০টি মোহর ডিপোজিটের বিপরীতে ১০০টি মুদ্রা জরুরি সঞ্চয় করা হয়েছিল, এখন ১,৯০০টি মুদ্রা ডিপোজিটের বিপরীতে জরুরি ভিত্তিতে ১৯০টি মুদ্রা রাখা উচিত। সুতরাং, আপণ ১৯০টি মুদ্রা সঞ্চয় করে মোট ৮১০টি মুদ্রা ঋণ দিবে। এবার সুদ আসতে থাকবে ৯০০ + ৮১০ = ১,৭১০টি মুদ্রার উপর। এদিকে নতুন ঋণগ্রহীতারা ঋণের মুদ্রা আবার খরচ করে ফেললে, অপর কারো আয় বৃদ্ধি পেয়ে মুদ্রা তাদের হাতে জমা হবে এবং ঘুরেফিরে দ্বিতীয় বার সিন্দুক থেকে বের হওয়া মুদ্রা সিন্দুকেই জমা হবে। আপণ এবারও মুদ্রা নিয়ে বসে নিশ্চয়ই ধ্যান করবে না। সে আবারো ঋণ দিয়ে দিবে। তবে এবারে সে ৮১টি মুদ্রা জমা রেখে ৭২৯টি মুদ্রা ঋণ দিবে।

এভাবে চলতে চলতে শেষ অব্দি মোট ৯০০ + ৮১০ + ৭২৯... বা ১০,০০০টি মুদ্রা ঋণ দেওয়া হয়ে যাবে। এই যে ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে মাত্র ১,০০০টি মুদ্রা ১০ গুণ করে ফেলা হল, অর্থনীতির ভাষায় এর নাম মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট।[২০] মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট হিসাব করতে আমরা অসীম ধারার সমীকরণ ব্যবহার করে থাকি।

আপণ প্রতি চক্রে ১০% মোহর রিজার্ভ করে রাখে। এই নীতির কারণে সুদি ব্যবস্থায় ১,০০০টি মুদ্রা ফুলেফেঁপে মোট ১০,০০০টি মুদ্রায় পরিণত হবে। এই ১০% রিজার্ভ রাখার হারকে বলে রিজার্ভ রেশিও বা আধুনিক ব্যাংকিং টার্মে Reserve Requirement Ratio. আর, বাংলাদেশ ব্যাংকের এপ্রিল ২০২১ সালের Reserve Requirement Ratio ছিল মাত্র ৪%!

উদাহরণে উল্লেখ করা মাত্র ১০% Reserve Requirement Ratio চক্রে পড়ে মাত্র ১০০০টি মোহর পুঁজি ১০,০০০টি মোহরে রূপ নেয়। আর ৪%

---

২০ অর্থনীতিবিদদের ধারণা, ব্যাংক থেকে বের হওয়া সম্পূর্ণ টাকা ব্যাংক ব্যবস্থায় ফেরত আসে না। কিছু টাকা মানুষ আলমারিতে বা পকেটে রেখে দেয়।
সাধারণত, ব্যাংকব্যবস্থা থেকে বের হওয়া শতকরা ৯০ ভাগ টাকাই আবার ফেরত আসে। বাকি ১০ শতাংশ হাতে হাতে ঘুরে, বা আলমারিতে সঞ্চিত থাকে ইত্যাদি। তবে বর্তমানে ডেবিট কার্ড এবং ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহারের ফলে প্রায় ক্যাশলেস ইকনমি হয়ে যাচ্ছে। তাই প্রায় পুরো টাকাই ফেরত আসার প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হচ্ছে।

রিজার্ভ রেশিওতে তা রূপ নিত ২৫,০০০ মোহরে। যাই হোক, আপণ মাত্র ১০ শতাংশ সুদ নিলে বছরে তার আয় হচ্ছে ৯০০টি স্বর্ণ মুদ্রা এবং ২০ শতাংশ সুদ নিলে আয় হচ্ছে ১,৮০০টি স্বর্ণ মুদ্রার। কিন্তু আপণের মূলধনই ছিল শূন্য। কেবলমাত্র সিন্দুককে পুঁজি করে, অন্যের টাকা ব্যবহার করে সে এই বিপুল লাভ করল।

ব্যাংক চালু করার পর প্রতি বছরে প্রাপ্ত নতুন সুদ হবে তার নিজস্ব পুঁজি। এই অর্জিত পুঁজি দিয়ে সে নিশ্চয়ই মোক্ষ লাভের সাধনা করবে না। বরং সুদের চক্র অবিরতভাবে চালিয়ে নতুন পুঁজির বিপরীতে আরো দশ গুণ ঋণ তৈরি করবে এবং সুদ খাবে। এভাবে ছুটতে থাকবে নতুন মুদ্রা তৈরি করে ঋণ প্রদানের ঘোড়দৌড়, তার সাথে বাড়তে থাকবে আয়, ঋণ ও সুদ।

'In the past people used to rob banks, now the banks rob the people.'

— David Alejandro Fearnhead
Freelance journalist

'এককালে, চোরেরা ব্যাংক লুটত, আর বর্তমানে ব্যাংকই মানুষের টাকা লুটে নেয়।'

—ডেভিড আলেহান্দ্রো ফার্নহেড

আচ্ছা, আপণ যে 'জমাকারীদের' পয়সা এত আপণ করে ফেলেছে, সেটা জানাজানি হলে কী হবে? জমাকারীরা বলে বসবে, ভাই আপনিও খাচ্ছেন, আমাদের দিবেন না? এপর্যায়ে আপণ গ্রাহককে অর্জিত সুদের ভাগ দিবে। 'সুদ-এর লাভ'-এর আশায় ব্যাংকে মুদ্রা জমা রাখা প্রত্যেকেই পরিণত হচ্ছেন এক একজন মহাজনে। আমাদের চতুর্দিকে এমন ক্ষুদে ক্ষুদে মহাজনে ভরপুর।

চিন্তার খোরাক

- বিশেষ কোন প্রযুক্তির সাহায্য ছাড়া কি ডিপোজিট ব্যাংকিং চালু করা সম্ভব? কেন বা কেন নয়?
- সবার সম্পত্তি বিনামূল্যে নিরাপদে জমা রেখে ব্যাংক কী সবার উপকার করছে, নাকি ক্ষতি করছে? কীভাবে?

মুক্তবাজার অর্থনীতি

হাওয়াই টাকা, চেক এবং ডিপোজিট স্কিম একসাথে চালু করলে, আমরা আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার একেবারে দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যাব। তবে সে লক্ষ্যে এখনো কিছু পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। বর্তমান বিশ্বের সাথে উপরের সবগুলো কাঠামোর একটি বড় পার্থক্য রয়েছে। এপর্যন্ত আলোচনায়, কেবল একজন মহাজন কিংবা একটি ব্যাংক উপস্থিত ছিল বলে ধরে নিয়েছি। তাই মুক্তবাজার এবং ব্যাংকিং প্রতিযোগিতা ছিল না। বর্তমান বিশ্বের চিত্র সেই তুলনায় আকাশপাতাল তফাৎ।

প্রথমত : বর্তমানে রাষ্ট্রে অনেকগুলো বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকে এবং এই ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার পরিবেশ বিদ্যমান থাকে। কোন ব্যাংকে সুদের হার কম এবং গ্রাহক সেবা উন্নত হলে, ব্যক্তি ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত হয়। নির্দিষ্ট ব্যাংকের ঋণ নিতে কেউ দায়বদ্ধ না। তাই বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহক আকৃষ্টে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করতে থাকে এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার কারণে ব্যাংক ঋণের উপর সুদের হার কমে আসে।

দ্বিতীয়ত : একটি অর্থনীতিতে ঋণ নেওয়ার মতো উপযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। গ্রহণযোগ্যতা যাচাই বাছাই না করে কোনো ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়া যায় না। এক পর্যায়ে ঋণ নেবার মতো উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়াটাই ব্যাংকের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। তাই ঋণের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি করা অসম্ভব।

সবশেষে : উপযুক্ত গ্রাহক খুঁজে পেতে, সেসাথে গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি, মার্কেটিং, ঋণ নেবার সক্ষমতা নিয়মিত যাচাই এবং সুষ্ঠুভাবে ক্যাশ পরিচালনা করতে ব্যাংককে অনেক অর্থ ব্যয় করতে হয়। এই সবকিছুর ফলে ব্যাংকের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে লাভ কমে যায়।

সব মিলিয়ে, বর্তমান বিশ্বে ব্যাংকিং খাত প্রতিযোগিতাপূর্ণ। রূপসাগর, জীবনসাগর কিংবা হৃদয়নগরের গল্পের মতো প্রাচীনকালের একচেটিয়া ব্যবসায় দাঁড়িয়ে নেই। তাই সুদও আগের মতো গলাকাটা মহাজনী পর্যায়ে নেই। এই কথাগুলো সত্য কিন্তু যেই প্রশ্নটি এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হচ্ছে 'প্রতিযোগিতা এবং মুক্তবাজার অর্থনীতি এসে পূর্বোক্ত

সমীকরণের ফলাফল বদলে দিয়েছে? নাকি, একই সমীকরণে কেবল মাত্রা বৃদ্ধি করেছে?'

প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে আমরা আমাদের কাঠামো থেকে আরো দুটি সরলীকরণের বাঁধ তুলে নেই। এখন যুক্ত হতে যাচ্ছে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা।

সুবর্ণনগরের অর্থনীতি গুণে, মানে এবং মুদ্রাব্যবস্থায় রূপসাগরের প্রতিরূপ। তবে বড়সড় পার্থক্য হচ্ছে, এখানে সুদের ব্যবসা দ্বৈতচেটিয়া। রূপসাগরের রিবার মতো যখন সুবর্ণনগরে কেউ ৫০টি মুদ্রা পুঁজিতে সুদের ব্যবসা শুরু করে, তার প্রতিবেশীও সমান সংখ্যক মুদ্রা পুঁজি নিয়ে সুদের ব্যবসা শুরু করে। লক্ষ্য করুন, সুবর্ণনগরে সুদ ব্যবসায়ী দুজন। উভয়ে মিলে একদিন দেশের সবকটি মুদ্রার মালিক হবে। কিন্তু কে, কতটুকু মুদ্রার মালিক হবে, তা অনিশ্চিত। তাই উভয়েই সম্ভাব্য সর্বোচ্চসংখ্যক মুদ্রা হস্তগত করতে, মরিয়া হয়ে লড়াই করবে।

এই প্রতিযোগিতায় জেতার মূল উপাদান তিনটি।

১. ঋণের পরিমাণ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ পরিমাণ বৃদ্ধি করা,
২. সম্ভাব্য সর্বনিম্নসংখ্যক গ্রাহক দেউলিয়া হওয়া এবং
৩. কোন গ্রাহক দেউলিয়া হলে সর্বোচ্চ পরিমাণ সম্পদ পুনরুদ্ধার করা।

দুজনেই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত বলে, ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে তারা মরিয়া হয়ে যাবে এবং কিস্তি আদায়ের বেলায়ও তাদের মুষ্ঠি কঠোর থেকে কঠোরতর হবে। এমনটি করতে না পারলে, প্রতিযোগিতার বাজারে পিছিয়ে পড়া সুনিশ্চিত।

নগণ্য সুদের হারই গ্রাহক আকৃষ্ট করে মোট ঋণ বৃদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়। দুই প্রতিবেশী একই এলাকার মহাজন হওয়ায় যার ঋণে সুদের হার কম, তার দরজাতেই ঋণগ্রাহকদের ভিড় জমবে। এভাবে উভয়েরই সুদের হার পাল্লা দিয়ে কমতে থাকবে। কিন্তু সব মিলিয়ে সমীকরণের মূল ফলাফল, অর্থাৎ ঋণগ্রহীতাদের দীর্ঘমেয়াদে নিঃস্ব হবার প্রবণতা বদলাবে কি? সেই প্রশ্নের উত্তরের আগে সংশ্লিষ্ট আরেকটা বিষয় দেখে নেই। তা হলো, বহু সংখ্যক সুদ কারবারি একত্রে প্রতিযোগিতায় নামলে মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সুদের রূপ কেমন হবে?

ধরি, প্রথম দুজনের পাশাপাশি আরো নতুন নতুন ব্যক্তি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুক্ত হলো। তারা প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকার জন্য সুদের হার আরো কমাবে। এভাবে সুদের দর কমতে কমতে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে এসে ঠেকবে,

যা হচ্ছে সুবর্ণনগরে সুদের বাজার দর (মার্কেট রেট)।[২২] এভাবে সেখানে 'মুক্তবাজার অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রথমে যখন, মহাজন একা ছিল, সুদের বাজার ছিল একচেটিয়া। একচেটিয়া বাজারে গ্রাহক সেবা হয় সর্বনিম্ন এবং পণ্যের মূল্য (বা সুদের হার) হয় সর্বোচ্চ।

পরবর্তীকালে, মহাজনের প্রতিবেশী এসে একই ব্যবসায় লিপ্ত হলে, বাজার পরিণত হল দ্বৈতচেটিয়ায়। দ্বৈতচেটিয়ার বাজারে পণ্যের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম এবং গ্রাহক সেবা উন্নততর।

সবশেষে, যখন সব প্রতিদ্বন্দ্বীই একত্রে প্রবেশ করল, তখন হয়ে গেল মুক্তবাজার অর্থনীতি। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে পণ্যের দাম, অর্থাৎ সুদের হার সর্বনিম্ন এবং গ্রাহক সেবা সর্বোচ্চ।

এই যে এত কিছু হলো, সব মিলিয়ে সমীকরণের ফলাফল বদলাল কি?

লক্ষ্য করুন, মুক্তবাজার সুদে প্রত্যেক সুদি মহাজনই কিছু না কিছু পুঁজি নিয়ে মাঠে নেমেছিল। তাদের পুঁজি যোগ করলে দেখা যাবে সব মিলিয়ে সমাজের প্রচুর পরিমাণ অর্থ ঋণে পরিণত হতে চাইছে। তাই তারা বিজ্ঞাপন দিয়ে, সুদের হার কমিয়ে বা সেলস এজেন্ট নিয়োগ করে অধিক সংখ্যক গ্রাহককে ঋণের আওতাভুক্ত করে ফেলবে। এভাবে সুদের হার কমলেও মোট ঋণ এবং ঋণী ব্যক্তির সংখ্যা বিপুল হয়ে যাচ্ছে। আর মুক্তবাজারে ঢাউস আকৃতির মোট ঋণ দ্রুতই বাজারের সব ব্যক্তিমালিকানাধীন মুদ্রাগুলোকে সুদি মহাজনদের (বা ব্যাংকারদের) মালিকানায় এনে ফেলবে। অর্থাৎ, দিনশেষে সব মুদ্রা মহাজনদের (বা ব্যাংকারদের) হাতেই কুক্ষিগত হবে। একারণে মুক্ত সুদের বাজার অর্থনৈতিক শোষণ এবং বৈষম্য থেকে সমাজকে মুক্ত করতে অক্ষম।

---

২২ একটি মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে সুদের হার কত হবে, তা নির্ভর করে প্রথমত, ঋণের বাজার ব্যবস্থার উপর। অর্থাৎ, বাজারে কী পরিমাণ তারল্য আছে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক কী ভূমিকা পালন করছে, ইত্যাদির উপর।

দ্বিতীয় সুদের হার নির্ধারণকারী বিষয়টি হল, একজন ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহণযোগ্যতা। সেজন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ভেদে সুদের হার ভিন্নতর হয়ে থাকে। আর্থিক অবস্থা চমৎকার পরিপাটি থাকলে সুদের হার কম, আবার কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হলে সুদের হার বেশি। একারণে আমরা রাষ্ট্রভেদে সুদের হারে ভিন্নতা দেখতে পাই, আবার একই অঞ্চলে এক এক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদের হার আলাদা হয়।

সব মিলিয়ে, ব্যাংকিং প্রতিযোগিতা সুদের কুফল থেকে সমাজকে কোন অংশেই মুক্ত করতে পারে না। এই প্রতিযোগিতা কেবল সুদের হার কম রাখার এই একটি উপকারই করতে পারে। অর্থনীতিতে সুদের হার কম সত্ত্বেও, সুদি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে গেলে মুদ্রা কেন্দ্রীভূত হতে বেশি সময় লাগে না। কারণ সমাজের অধিকাংশ অর্থ সুদের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। আর আন্তঃব্যাংক উগ্র প্রতিযোগিতায় গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি পেলেও, একে সরলভাবে গ্রহণযোগ্য ভেবে নেয়ার কিছু নেই। 'ব্যাংক যত নম্র-ভদ্রই হোক না কেন, কৌশলে সে আপনার সম্পত্তি নিজ মালিকানাভুক্ত করে ফেলে।'

বই এর প্রারম্ভেই আমরা হিসাব করে দেখিয়েছিলাম যে, সুদের হার কম হলেও, সব মুদ্রা এক কব্জাতেই আসছে। এখন আমরা দেখলাম, এক কারবারির জায়গায় একাধিক কারবারি আসলেও সমীকরণটার কিছুই বদলাবে না। সুদি কারবারিদের হাতেই সব মুদ্রা পুঞ্জিভূত হবে।

একটি এলাকা দশ জন ভূমিদস্যু দখল করে নিলে, তাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। বিষয় হলো কে, কত বড় এলাকা নিজের দখলে নিবে। ঠিক তেমনি সুদের কারবারিরাও সব মুদ্রা দখল করার পরে, নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে থাকবে যেন সর্বোচ্চ সম্পদ নিজের হস্তগত রাখতে পারে। তবে এই যুদ্ধ ঢাল তলোয়ারের না, ঋণের। ঋণ দিতে পারলে, ক্ষমতার সীমানা বড় হয়। আবার গ্রাহকরা বিনা জামানতে ঋণ খেলাপি করলে, সীমানা ছোট হয়। এই দুই সমীকরণের মার-প্যাঁচে নির্ধারিত হয়, কার রাজত্ব কত বিশাল।

অষ্টম অধ্যায়

এই পর্যন্ত আমরা কেবল লেসে ফেয়ার বা স্বাধীন অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেছি, একদম আদিম ও অকৃত্রিম অর্থনীতি যাকে বলে। সেখানে ছিল না কোন কেন্দ্রীয় ব্যাংক, ছিল না কোনো সরকারি নীতিমালা, ছিল না কোনো শক্তিশালী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান।

সেই হিসেবে, আমরা অনেকটা ভিন্ন পৃথিবীতে আছি। এই পৃথিবীতে উপরের সূত্রগুলো খাটবে কিনা, সেই প্রশ্নের উত্তর ইতিহাস এবং তথ্যের নিরিখে দেওয়া প্রয়োজন।

টাকার গোপন রহস্য

একসময় টাকা বলতে বোঝাতো সোনা, রূপা, তামা, নিকেল, কড়ি, পাখির পালক, কাঠের দণ্ড ইত্যাদি। পৃথিবীর একেক স্থানে একেক কালে একেক রকম টাকা চালু ছিল। তাই টাকার বিশ্বব্যাপী কোন সাধারণ রূপ ছিল না। মুদ্রার গুণাবলিযুক্ত যেকোন বস্তুই ছিল টাকা। তবে প্রাচীন চীনে টাকা হিসেবে পছন্দের তালিকায় শীর্ষে ছিল তামা। মধ্যযুগের শেষে ইয়োরোপে পছন্দের চূড়ায় চলে আসে সোনা। এদিকে সোনার মুদ্রা জনপ্রিয়তা ইয়োরোপে নতুন একটি সমস্যা সৃষ্টি করল, সরবরাহের অপ্রতুলতা। বড় অর্থনীতিতে বাড়তি লেনদেনের জন্য বাড়তি সোনার দরকার পড়ে। তাই নতুন খনি আবিষ্কার করে সোনা উৎপাদনের চাহিদাও আকাশ ছুঁতে লাগলো। সুষম সরবরাহ অনিশ্চিত হলেই শুরু হয় মূল্যহ্রাস (বা সোনার দাম বৃদ্ধি)। এই সোনার খোঁজেই কলম্বাসসহ বহু অভিযাত্রী সমুদ্রপথে পাড়ি জমান।

সোনা ব্যবহারের আরো কিছু অসুবিধা হলো এটি অনেক মূল্যবান এবং ভারী। তাই ঘরে সোনা জমা করে রাখা ছিল অনিরাপদ এবং বড়সড় কেনাকাটা করতে বহন করাটাও অসুবিধাজনক। তবে তার সহজ সমাধান

মানুষ আবিষ্কার করে ফেলে। শহরের পছন্দমাফিক একজন স্বর্ণকারের সিন্দুকে যার যার স্বর্ণ জমা রাখবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তুলে খরচ করবে। জমাকারীর জমাকৃত সোনার বিপরীতে স্বর্ণকার একটি কাগজের রিসিপ্ট লিখে দিবেন, 'সিন্দুকে অমুক ব্যক্তির এত পরিমাণ স্বর্ণ জমা আছে।' পরবর্তীকালে এ ব্যক্তি রিসিপ্ট দেখিয়ে সোনা তুলে আনতে পারবে। এই সেবার বিনিময়ে স্বর্ণকারকে কিছু পারিশ্রমিক দিতে হবে যেহেতু তিনি সোনার কঠোর নিরাপত্তা প্রদান করছেন।[২৩]

বর্তমান সময়ের ব্যাংকের মতোই সেই সময় ইয়োরোপে স্বর্ণের মালিকরা স্বর্ণকারের সিন্দুকে সোনা জমা রাখতেন এবং একটু একটু খরচ করতেন। এতে দুটি উপকার পাওয়া যেত। চোর-ডাকাতের আক্রমণ থেকে ঘর নিরাপদ থাকত। গ্রাম থেকে শহরে আসা যাবার সময় বিপদ সংকুল পথে বার বার সোনা বহন করতে হতো না। এক পর্যায়ে মানুষ চিন্তা করল, বার বার জমিয়ে রাখা সোনা উত্তোলনসাপেক্ষে হাত বদল না করে, কেন রিসিপ্টটাই বদল করছি না?

উদাহরণস্বরূপ, মেরি নিকলাসের থেকে একটি জমি কিনলে, সিন্দুক থেকে সোনা তুলে এনে নিকলাসের হাতে গছিয়ে দেবার মতো ঝামেলা করবে না। বরং রিসিপ্টটাই নিকলাসের হাতে তুলে দিয়ে বলবে নিজ দায়িত্বে শহরে গিয়ে এই ঠিকানা থেকে সোনা তুলে নিও। এই প্রস্তাবে নিকলাসও মনে মনে সন্তুষ্ট। কারণ, শেষকালে তাকেও কোন না কোন নিরাপত্তা প্রদানকারীর সিন্দুকেই স্বর্ণ জমা রাখতে হতো। এখন তাকে সেই বাড়তি ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে না। তাই মেরির কাগজের বিনিময়ে নিকলাস মেরির নামে জমি লিখে দিতে রাজি হয়ে গেল।

এখন নিকলাস চাইলে যেকোনো মুহূর্তে স্বর্ণকারের রিসিপ্ট দেখিয়ে, নিজ মর্জি মতো সোনার মুদ্রা তুলে আনতে পারবে। আবার চাইলে সে মেরির মতো নোটের বিনিময়ে নতুন একটা জমি কিনতেও পারে। এভাবেই সমাজে প্রাথমিক পর্যায়ে 'কাগজের বিনিময়ে লেনদেন' প্রথা শুরু হল। পরবর্তীকালে যার নাম দেওয়া হলো টাকা। এক বাক্যে স্বর্ণকারের সিন্দুকে জমা রাখা স্বর্ণের রিসিপ্টই (নোট) হচ্ছে টাকা।[২৪]

---

২৩ এটি একটি ব্যবসা মডেল এবং এই প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সুদ মুক্ত।
২৪ এখন পর্যন্ত পুরা প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ সুদ মুক্ত এবং ন্যায্য।

সর্বপ্রথম চীনে ব্যাপক ভাবে টাকার প্রচলন শুরু হয়। ১৩ শতাব্দীতে মার্কো পোলো চীন ভ্রমণ শেষে ইয়োরোপে ফেরত এসে তার নিখুঁত বর্ণনা করে গেছেন যা তৎকালীন ইয়োরোপীয় শ্রোতাদের নিকট গল্পের মতোই মনে হয়েছিল।

'All these pieces of paper are, issued with as much solemnity and authority as if they were of pure gold or silver... with these pieces of paper, made as I have described, Kublai Khan causes all payments on his own account to be made; and he makes them to pass current universally over all his kingdoms and provinces and territories, and whithersoever his power and sovereignty extends... and indeed everybody takes them readily, for wheresoever a person may go throughout the Great Khan's dominions he shall find these pieces of paper current, and shall be able to transact all sales and purchases of goods by means of them just as well as if they were coins of pure gold'

– Marco Polo, The Travels of Marco Polo

'পরিপূর্ণ আনুষ্ঠানিকতা এবং কর্তৃত্বের সাথে কাগজের টুকরোগুলি জারি করা হয়, যেন সেগুলো খাঁটি সোনা বা রূপার তৈরি... যেমনটা বলছিলাম, উক্ত কাগজের টুকরোগুলো ব্যবহার করেই কুবলাই খান নিজের সকল খরচ বহন করেন; তার ক্ষমতাধীন সকল রাজ্য, প্রদেশ ও অঞ্চলে এবং উনার কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের পরিসর নতুন এলাকায় সম্প্রসারিত হলে সেখানেও তিনি নোটগুলো জারি করেন... সত্যিই, সবাই তাৎক্ষণিকভাবে নোটগুলোকে লুফেও নেয়। একজন ব্যক্তি গ্রেট খানের রাজত্ব জুড়ে যেখানেই যান না কেন, গণমানুষের মধ্যে এই কাগজের নোটগুলোর ব্যবহারিক উপযোগিতা দেখতে পাবেন, এবং সেগুলোর মাধ্যমে তিনি নিজের সব ক্রয়-বিক্রয় লেনদেন এমনভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন, যেন ওগুলো খাঁটি সোনার মুদ্রা।'

—মার্কো পোলো, দ্যা গ্রেট ট্রাভেলস অব মার্কো পোল

আমাদের অনেকের মাঝে একটি ভুল ধারণা প্রচলিত আছে যে, টাকার মালিক সরকার এবং সরকার নিজ প্রয়োজনে টাকা ছাপিয়ে রাষ্ট্রের ব্যয়ভার বহন করতে পারে। এই ধারণাগুলো সত্য নয়। উপরের বর্ণনায় লক্ষ্য করুন, কাগুজে নোট বা টাকা কিন্তু সরকার উৎপাদন করেনি। জনগণ এবং সোনার পাহারাদারের সমন্বিত উদ্যোগে সোনার মজুদের বিপরীতে টাকা তৈরি হয়েছে। যেহেতু কারোরই সোনা তৈরি করার ক্ষমতা নেই, প্রাথমিক ভাবে টাকা সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি মুদ্রাব্যবস্থা হিসেবেই গড়ে উঠেছিল এবং এর উপর ব্যাংক বা সরকার কারো কোন হাত ছিল না। টাকা ছিল কেবলমাত্র একটি জমাকৃত সোনার রিসিপ্ট। পরে অবশ্য এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসা শুরু করে, যা আমরা অচিরেই আলোচনা করব।

আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার চমক

মানুষ গণহারে স্বর্ণকারের সিন্দুকে সোনা জমা রাখা শুরু করতেই কিছু অলস সোনা সবসময় সিন্দুকে জমা পড়ে থাকত। এই অলস পড়ে থাকা সোনা মুদ্রা কাজে লাগানোর কৌশল নিয়ে নিয়ে স্বর্ণকারেরা চিন্তা-ভাবনা করে এক চমৎকার বুদ্ধি বের করল। তারা এই সোনা ঋণ হিসেবে তৃতীয় পক্ষকে ধার দিয়ে দিল। এদিকে সবাই যেহেতু একসাথে সোনা তুলতে আসতো না, গ্রাহকদেরও কোনো সমস্যায় পড়তে হত না। সোনার জায়গায় সোনা এবং ঋণের জায়গায় ঋণ হাতে হাত ধরে চলত। এভাবে সোনার মালিক না হয়েও স্বর্ণকাররা ঋণের উপর সুদ ভোগ করতে আরম্ভ করল এবং ইয়োরোপে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যাংকিং শুরু হলো।

এদিকে কাগুজে মুদ্রার ব্যবহার চালু হওয়ায় ব্যাংকারদের অবস্থা একেবারে লালে লাল। কারণ নোট দিয়েই যদি কাজ হয়ে যায়, সোনা তোলারই বা প্রয়োজন কী? এভাবে সিন্দুকে আরো বেশি পরিমাণ অলস সোনা জমতে থাকলো এবং ব্যাংকাররা তা ঋণ দিয়ে আরো বেশি পরিমাণ সুদ অর্জন করতে লাগলো।

লক্ষ্য করুন, ব্যাংকিং সিস্টেম আসার ফলে কাগুজে মুদ্রা আর বিশুদ্ধ সোনার রিসিপ্ট থাকলো না। ব্যাংক নোটের বিপরীতে যেই সোনা সিন্দুকে গচ্ছিত থাকার কথা ছিল তা ঋণ দেওয়া হয়ে গেল। আরো বড় একটি সমস্যা হচ্ছে, ঋণ দেবার পরে যদি ঋণ বিফলে যায়, অর্থাৎ, কেউ দেউলিয়া হয়ে যায়, তখন সিন্দুকের মূলধন থেকেই বিফল হওয়া অংশটি উধাও হয়। কোন কারণে অতিরিক্ত সংখ্যক গ্রাহক দেউলিয়া হলে (সুদের তুলনায় বিফল ঋণ বেশি হলে) সিন্দুকের সোনার পরিমাণ অস্বাভাবিক কমে যায়। স্বভাবতই ব্যাংকাররা এমন তথ্য গোপন রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু সত্য হোক বা মিথ্যা হোক মুখে মুখে একবার এরকম সংকটের তথ্য ছড়িয়ে গেলে, সবাই নোট ভাঙিয়ে সোনা তুলতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং সাথে সাথেই ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যায়। ইতিহাসে অনেকবার এমন ঘটনা ঘটেছে। ইংরেজিতে যাকে বলে Bank Run।

কাগুজে নোট ক্রমান্বয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলে, ব্যাংকারদের মাথায় নতুন আরেকটি বুদ্ধি আসলো। ব্যাপারটা এমন— সিন্দুকের সোনা ঋণ না দিয়ে নতুন নোট লিখে ঋণ আকারে বাজারে ছাড়া শুরু করে। ১০ জন গ্রাহক মোট ১,০০০টি মুদ্রা জমা করলে ব্যংকার আগে ১০টি নোট লিখে দিত। তারপরে কুঠুরির ৮০০টি সোনার মুদ্রা ঋণ দিয়ে দিত। কিন্তু এখন

নতুন একটি ফন্দি এসেছে। সবার হাতে হাতে টাকা বিনিময়ের চল শুরু হওয়ায় ৮০০টি মুদ্রা সিন্দুক থেকে বের না করে বরং এই মুদ্রার বিপরীতে নুতন নোট লিখে ঋণ দিয়ে দিল। এতে আর সিন্দুকের ডালা খুলতে লাগলো না এবং সব মুদ্রা ভেতরেই জমা থাকলো। এদিকে যাকে ঋণ দিলাম তাকেও বলে দিল, 'তুমি চাইলে এই নোট ভাঙিয়ে আমার থেকে ৮০০টি মুদ্রা যখন প্রয়োজন তখন তুলে নিতে পারবে।' কিন্তু যেহেতু অনেকেই নোট ব্যবহারে অভ্যস্ত যাকে ঋণ দিল সেও সোনা তোলার ঝামেলা করল না। ফলে সিন্দুকের সোনা জায়গাতেই পড়ে রইল এবং আমি ৮০০টি মুদ্রার উপরে সুদ পেতে থাকল। অত্যন্ত নিরাপদ আয়।

খেয়াল করে দেখুন, সিন্দুকে জমা আছে ১,০০০টি মুদ্রা কিন্তু ১,৮০০টি মুদ্রার নোট ইস্যু করা হয়ে গেছে। অর্থাৎ, ব্যাংকাররা টাকা বানানো শুরু করল (এর আগে সিন্দুকের জমাকৃত সোনা ঋণ দেওয়ার মাধ্যমে তারা স্বর্ণ বানিয়েছিল)।

পরবর্তীকালে, ব্যাংকাররা ততোধিক দুঃসাহসী এবং অভাবনীয় লাভজনক একটি কৌশল প্রয়োগ করতে থাকল। তারা জমাকৃত সোনার চেয়ে অধিক পরিমাণে ঋণ দেওয়া শুরু করল। উপরে লক্ষ্য করুন, সিন্দুকে জমা আছে ১,০০০টি সোনার মুদ্রা, কিন্তু এর বিপরীতে নোট ইস্যু করা হয়েছে ১,৮০০টি মুদ্রার (গ্রাহকের ১,০০০টি এবং ব্যাংকারের ৮০০টি)। কিন্তু খুব কম মানুষই টাকা ভাঙিয়ে সোনাতে রূপান্তর করছে দেখে ব্যাংকাররা ভাবল সিন্দুকে তো অলস মুদ্রা পড়ে আছে। আরো কিছু নোট ইস্যু করলে ক্ষতি কি?

ক্ষতি তো নেইই, বরং লাভ হবে সবদিক থেকে। তাই তারা আরো কিছু নোট লিখে ঋণ ইস্যু করতে লাগলো। দেখা গেলো, আছেই কেবল ১,০০০টি মোহর অথচ ৫,০০০টি মোহরের নোট ইস্যু করা হয়ে গেছে। এভাবেই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং (Fractional Reserve Banking) যাত্রা শুরু করে। ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের কল্যাণে ব্যাংকাররা মাত্রাতিরিক্ত ধনী হয়ে উঠে। অপরদিকে, অতিরিক্ত টাকা নিয়মিতভাবে অর্থনীতিতে প্রবেশ করায় ইনফ্লেশন জীবনের নিত্যসঙ্গী হয়ে যায়। এই পর্যায়ে এসে গ্রাহকরা দাবি করতে থাকে, 'তুমি একাই সব লাভ নিবে তা হয় না, আমাদের ডিপোজিট ব্যবহার করে তোমার লাভের থেকে আমাদেরকেও একটি অংশ দাও।' এভাবে ডিপোজিটের বিনিময়ে সুদ অর্জন করার ধারা শুরু হলো।

এক আনায় ছয় আনা

ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ পদ্ধতি নিয়ে আরেকটু গভীরে আলোচনা করা যাক। আমি স্টকহোম ব্যাংকে ১০০টি মোহর জমা রাখলাম। বিনিময়ে পেলাম ১০০টি মোহরের একটি নোট। এবার স্টকহোম ব্যাংক আমার সোনার মুদ্রাকে পুঁজি করে আরো ৬০০টি সোনার মুদ্রার নোট তৈরি করে ঋণ দিয়ে দিল। তাহলে ব্যাংক কি সোনা উৎপাদন করল? উত্তর হচ্ছে, হ্যাঁ। আমি কষ্টে অর্জিত ১০০টি সোনার মুদ্রার বিনিময়ে যা পাই, কেবল মাত্র সিন্দুকে তালা মেরে আমারই মোহর দিয়ে ব্যাংক সেরকম আরো ৬টি নোট পায়। এদের প্রত্যেকটির বিনিময় মূল্য আমার অর্জনের সমপরিমাণ!

জমির দলিল থাকা যেমন জমি থাকার সমান, ঠিক তেমনি সোনার মুদ্রা হাতে থাকা এবং সোনার মুদ্রার নোট হাতে থাকা প্রায় একই সমান। তাই স্টকহোম ব্যাংক ৬০০টি স্বর্ণ মুদ্রার বিনিময়ে যেই সুদ পেত, বর্তমানে কোন পুঁজি ছাড়াই এই ৬টি নোটের বিনিময়ে সেই পরিমাণ সুদ অর্জন করবে। তাই দলিল বা নোট উৎপাদন সোনা উৎপাদনের মতই কার্যকরী।

সব মিলিয়ে অর্থ দাঁড়ালো, ব্যাংক একটি সোনার খনি। আর তা সম্ভব হয়েছে ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের জাদুকরী হাওয়াই টাকা ছাপানোর ক্ষমতার বলে। ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং নীতিতে এমনটি করা অসম্ভব হতো। অর্থনীতির বইয়ের ব্যাংকিং বিষয়ক পড়ালেখাগুলো মূলত ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিং নিয়েই পড়াশোনা। প্রাত্যহিক জীবনেও ব্যাংক সম্পর্কিত ভাবনায় ফুল রিজার্ভ ব্যাংকিংই কল্পনা করি। কিন্তু আসলে সব ব্যাংকই ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংক। আর একারণেই ব্যাংকের প্রভূত ক্ষতি সম্পর্কে অর্থনীতির ছাত্ররা আগাগোড়াই বেখবর। অপর দিকে ব্যাংকের চাকুরেরাও ক্যারিয়ারের কথা ভেবে ভেবেই জীবন পার করে দেন। অর্থনীতির উপর ব্যাংকের প্রভাব নিয়ে বিন্দুমাত্রও মাথা ঘামান না। অনেকে ধরেই নেন, বর্তমান ব্যাংকিং ব্যবস্থা আগের যুগের ভয়ংকর সেই মহাজনী সুদের মতো নয়। এমন ধারণাও চলে যে, বর্তমান ব্যাংকিং ও মুদ্রাব্যবস্থার বিরুদ্ধে কথা শুধুই ইসলামী আবেগপ্রসূত জায়গা থেকে উৎসারিত যা অর্থনৈতিক বাস্তবতার সাথে পুরোপুরি সম্পর্কহীন অগুরুত্বপূর্ণ বাতচিৎ মাত্র। তাদের দৃষ্টিতে এমন একটি বই ষড়যন্ত্র তত্ত্ব (conspiracy theory) যা অর্থনীতির তত্ত্ব ও তথ্যের সাথে বন্ধনহীন এবং আবেগের জায়গা থেকে লেখা।

এই ধারণাগুলো চূড়ান্তভাবে ক্ষতিকর। বর্তমান মুদ্রা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা হিন্দু-খ্রিস্টান, বৌদ্ধ-নাস্তিক, নারী-পুরুষ সকলের জন্য একটি মরণ ফাঁদ।

এর সাথে বিশেষ কোন ধর্ম বা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের সম্পর্ক নেই। এই বইতে ব্যক্তিগত আবেগ, বিশ্বাস বা মতামতের বিন্দুমাত্রও স্থান দেওয়া হয়নি, বরং বইটি অর্থনীতির নিখাঁদ তত্ত্ব ও প্রয়োগের সহজবোধ্য বিশ্লেষণ।[২৫]

সীমা পরিসীমা

ব্যাংক নোট বা টাকা আবিষ্কার হওয়ার পরেও মানুষ কেবল বড়সড় লেনদেন নোট দিয়ে করতো। বাদবাকি সকল ক্ষেত্রে নোটের চাহিদা ছিল সীমিত। তাই ব্যাংক চাইলেই যত ইচ্ছা তত নোট লিখতে সক্ষম ছিল না, এই সীমা ছিল। ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ বা আংশিক সঞ্চয়ের একটি অদৃশ্য সীমানা রক্ষা করাটা জরুরি ছিল। অতি লোভে বেশি নোট ইস্যু করলে ঝুঁকি প্রচণ্ড বেড়ে যেত। কারণ বেশি নোট ইস্যু হলে সবাই একটু একটু করে সোনা তুললেও সিন্দুক খালি হয়ে যেত। আবার মাথাপিছু অল্প ঋণ বিফলে গেলেও ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যেত। তাই ঋণের বোঝা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পাওয়া বা অতিরিক্ত টাকা ছাপানো একটি ব্যাংকের জন্য দুর্বলতার প্রতীক ছিল। অপরপক্ষে, ব্যাংকের রিজার্ভ বেশি থাকা এবং ঋণ কম থাকা ছিল অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্যের প্রতীক। কথাগুলো বর্তমান যুগেও সত্য ও প্রযোজ্য। তবে অতীতের সাথে বর্তমানের একটি পার্থক্য হচ্ছে, সেকালে প্রত্যেকটি ব্যাংকের নিজস্ব নোট ছিল। বর্তমানের মতো শুধুই এককভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জারি করা নোট ছিল না। তাই একই সাথে বিভিন্ন রকমের নোট চলত। কোনো ব্যাংকের অর্থনৈতিক সুস্বাস্থ্য থাকলে, সেই ব্যাংকের নোটের গ্রহণযোগ্যতা বেশি থাকত। আর যেই ব্যাংকের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য যত খারাপ ছিল সেই ব্যাংকের নোটের গ্রহণযোগ্যতা ছিল তত কম। আরেকটি মজার ব্যাপার হচ্ছে, একজন বিক্রেতা চাইলে ব্যাংক নোট ফিরিয়ে দিতে পারতেন বা সরাসরি স্বর্ণমুদ্রা চাইতে পারতেন অথবা পছন্দসই ব্যাংকের নোট দাবি করতে পারতেন। যেমন আপনার কাছে ইয়র্কশায়ার ব্যাংকের নোট আছে। কিন্তু সম্প্রতি ইয়র্কশায়ার ব্যাংকের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে। আপনি সেই ব্যাংকের ১০টি মোহরের একটি নোটের বিনিময়ে কিছু কিনতে গেলে, বিক্রেতা সেই নোটটি ফিরিয়ে দিতে পারবেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে

---

২৫ আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে কোন ইসলামী সোর্স থেকে এসকল জ্ঞান অর্জন করিনি। এই বিষয়ে আমার জ্ঞানের প্রায় সম্পূর্ণটাই অমুসলিম পশ্চিমা অর্থনীতিবিদদের মাধ্যমে পাওয়া।

বলেও বসতে পারতেন, 'এই ব্যাংকের ১৫টি মোহরের নোট দেয়া লাগবে, তবে লন্ডন ব্যাংকের ১০টি মোহরের নোট দিলেও চলবে।' এক্ষেত্রে ক্রেতার কোন অধিকার ছিল না। সেজন্য নিজের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাবিধানে সব ব্যাংকের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের যথাযথ খোঁজ খবর নিয়ে সম্ভাবনাময় ও সমৃদ্ধ ব্যাংকে টাকা জমা রাখা ভয়ানক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।[২৬]

ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিংয়ের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু ব্যাংক স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হয়। অবিশ্বাস্য পরিমাণ নোট ছাপিয়ে ঋণ দিতে থাকে। এদিকে ভেতরের অবস্থা গড়বড় হয়ে পড়লে, মানুষ ধেয়ে আসতো সোনা উঠিয়ে নিতে। ফলে, ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে পড়ত। আবার একটি ব্যাংক দেউলিয়া হলে বাকি ব্যাংকের গ্রাহকদেরও টনক নড়ে উঠতো। তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ব্যাংক ডিপোজিট তুলতে রেস শুরু করতো। কিন্তু গ্রাহকের দৌড়াদৌড়িই সার। ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ এর কারণে নোটের সমপরিমাণ সোনা তো সিন্দুকেই থাকত না। ফলে সমগ্র অঞ্চলে মুদ্রাকেন্দ্রিক বিপর্যয় দেখা দিতো। এই সমস্যার কারণে একাধিকবার ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যেমন, ১৬৬০ সালে সুইডেনে। সে সময় ব্যাংকের সোনার পরিমাণের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ নোট মার্কেটে আছে দেখে সবাই সন্দেহ করা শুরু করল। গ্রাহকরা অনতিবিলম্বে ব্যাংকে গেল নিজ নিজ মোহর বুঝে নিতে। ফলাফলস্বরূপ সুইডেনের অর্থনীতিই ধসে যায়।

এভাবে লাগাতার ব্যাংকগুলোকে দুর্দশায় পড়তে দেখে, ব্যাংকাররা সবাই মিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে। এর কাজ ছিল সদস্য ব্যাংকের কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা। আবার একই সাথে সদস্য ব্যাংকের জন্য আইন প্রনয়ন করা, কী পরিমাণ রিজার্ভের বিপরীতে কত অংকের ঋণ দেওয়া যাবে (বা নোট ইস্যু করা যাবে)।

এই পর্যন্ত পড়া ইতিহাসের আলোকে আমরা বলতে পারি, মুদ্রাব্যবস্থা সরকার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন একটি প্রক্রিয়া। সোনার মুদ্রা তৈরি হয় খনি থেকে। আর কাগুজে মুদ্রা তৈরি হয় ব্যাংক থেকে। এই উভয়ের সাথেই সরকারের কোন সংযোগ নেই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথেও সরকারের কোন সংস্রব নেই। মস্ত সব ব্যাংকাররা একত্র হয়ে এই কেন্দ্রীয় ব্যাংক তৈরি করে, যা আবার সকল সদস্য ব্যাংকের অভিভাবকও বটে। সাধারণ নাগরিকদের

---

২৬ লক্ষ্য করুন, কীভাবে ব্যাংক এসে মানুষের সঞ্চয় করার প্রবণতাকে অনিরাপদ করে দিল।

মতোই সরকার বা রাজ্যের রাজাও নিজ ইচ্ছা মতোন টাকা ছাপাতে পারে না। তাদেরকে ঋণ নিতে ব্যাংকের দ্বারস্থ হতে হয়। টাকা ছাপানোর ক্ষমতা নেই বলেই সরকার রাস্তা, সেতু বা হাসপাতাল তৈরিতে, কর এবং শুল্ক আদায় করেই ব্যয়ভার বহন করে। সরকারের আয় কোন বছরের ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে, সে অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ আকারে গ্রহণ করে। আবার কোন বছরের আয় সেই বছরের ব্যয় অপেক্ষা বেশি হলে, বাড়তি অর্থ দিয়ে পূর্বের ঋণ শোধ করে অথবা ভবিষ্যত ব্যয়ের জন্য সঞ্চয় করে রাখে। সরকার নিজে টাকা ছাপাতে পারলে, কর আদায় করার বা ঋণ নেবার প্রয়োজন পড়ত না।

'When a government is dependent upon bankers for money, they and not the leaders of the government control the situation, since the hand that gives is above the hand that takes. Money has no motherland; financiers are without patriotism and without decency; their sole object is gain.'

—Napoleon Bonaparte
French military and political leader

'দেশের সরকার ব্যাংকারদের উপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়লে, সরকারের বদলে ব্যাংকাররাই দেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে। কারণ, দাতার হাত উপরে থাকে। টাকার কোন মাতৃভূমিপ্রীতি নেই; ব্যাংকারদেরও দেশপ্রেম বা পরিমিতিবোধ নেই। তাদের একমাত্র লক্ষ্যই হল মুনাফা করা।'

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট
ফ্রেঞ্চ সেনাপ্রধান ও রাজনীতিবিদ

'The modern banking system manufactures money out of nothing. The process is perhaps the most astounding piece of sleight of hand that was ever invented.'

–Josiah Charles Stamp
1st Baron Stamp, English industrialist, economist, civil servant, statistician, writer, and banker. He was a director of the Bank of England and Chairman of the London, Midland and Scottish Railway.

'আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থা শূন্য থেকে টাকা তৈরি করে। এটা এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সকল ধোঁকাবাজির মধ্যে সবচেয়ে চমকপ্রদ ধোঁকাবাজি।'

— *জোসিয়া স্ট্যাম্প*
১ম ব্যারন স্ট্যাম্প, ইংরেজ শিল্পপতি, অর্থনীতিবিদ, আমলা, পরিসংখ্যানবিদ, লেখক ও ব্যাংকার। তিনি ব্যাংক অব ইংল্যান্ড এর একজন ডিরেক্টর এবং লন্ডন-মিডল্যান্ড-স্কটিশ রেলওয়ের চেয়ারম্যান ছিলেন।

ব্যাংকভেদে ভিন্ন ভিন্ন নোট ইস্যু করায় লেনদেন ঘোর সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়াল। কেউ দূরের কোন শহরে ঘুরতে গেলে, নিজ শহরের ব্যাংক নোট সমান মূল্যে কাজে লাগাতে পারতেন না। আর কোন ব্যাংক দেউলিয়া হলে, সেই ব্যাংকের নোটটাই অচল হয়ে যেত। বাজারে সব রকম নোটের লেনদেন চালু থাকায়, কোন ব্যাংকের অবস্থা কেমন, তা জেনে-শুনে সিদ্ধান্ত নেওয়াটাও ছিল দুরূহ।

এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আলাদা আলাদা অস্থায়ী নোটের স্থলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সারা দেশে একটি স্থায়ী সাধারণ নোট তৈরির পরিকল্পনা নেয়। এটার নাম দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট। তৎকালে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাথে সরকারের কোন সংযোগ ছিল না।

প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট বাজারে ছাড়াকালে অন্যান্য ব্যাংকের নোটও পাশাপাশি চালু ছিল। পরবর্তীকালে, ধীরে ধীরে সব ব্যাংককে এক ছাতার নিচে আনা হয়। একসময়ে গিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটকেই একমাত্র legal tender হিসেবে ঘোষণা করা হল। এজন্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটের গায়ে লেখা থাকে 'চাহিবামাত্র ইহার বাহককে... দিতে বাধ্য থাকিবে।' মধ্যবর্তী এই শূন্যস্থানে তারা যেকোন অংকের টাকার সংখ্যাটা উল্লেখ করতে পারে এবং উল্লেখ করাও থাকে। অর্থাৎ, এখন থেকে আর কোন বিক্রেতা এই নোট ফিরিয়ে দিতে পারবে না, গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবে। তাই নোট ফিরিয়ে কোন পণ্যের সোনাতে মূল্য পরিশোধ চাওয়ার কোন উপায় নেই। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক এই গ্যারান্টি প্রদান করা ছিল যে, কেউ চাইলেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গিয়ে নোট ভাঙিয়ে সমপরিমাণ সোনা তুলে নিতে পারবে। এই হচ্ছে 'কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোটের' ইতিহাস। এভাবেই, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সারাদেশে লেনদেনের একটি সাধারণ নোট নিয়ে আনলো।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সুইডেনের রিকস বাংক বা Riksbank (সুইডিস ভাষায় ব্যাংককে বাংক বলে)। পরবর্তীকালে এই ব্যাংকের আদলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্সসহ ইয়োরোপের অন্যান্য দেশেও কেন্দ্রীয় ব্যাংক গড়ে উঠে। এগুলো সবগুলোই ছিল ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্স তাদের নিজ নিজ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোকে জাতীয়করণ করে ফেলে। তবে এখনো পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

আমেরিকা ছাড়াও পৃথিবীর অন্য অনেক দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান।

সোনা-রূপার মুদ্রা ছেড়ে কাগজি মুদ্রা

১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট, সেই দিনটি ছিল রবিবার। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন অত্যন্ত জরুরি একটি ঘোষণা নিয়ে গম্ভীর মুখে টিভি পর্দায় আবির্ভূত হলেন। কেউ ভাবতেও পারেনি, কী ঘোষণা আসতে যাচ্ছে। গুরুগম্ভীর সে ঘোষণায় তিনি জানিয়ে দিলেন, আজকে থেকে স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা স্থগিত ঘোষণা করা হলো। সেই বিবৃতিটি পৃথিবীর সবাইকে এতটাই হতবাক করেছিল যে, সিদ্ধান্তটি নিক্সন শক (Nixon Shock) হিসেবে বিখ্যাত।[২৭]

কিন্তু কেন ঘটেছিল এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি, আর সেটার প্রভাবটাই বা ছিল কেমন?

সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। প্রলয়ঙ্করী সেই যুদ্ধের আর্থিক ক্ষতি বিশ্বব্যাপী সবাইকেই স্পর্শ করেছিল। বিশ্বযুদ্ধের ব্যয়ভার বহনে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং অন্য ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রসমূহকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ নিতে হচ্ছিল। কেউ জানতো না, যুদ্ধটার শেষ কোথায়। কিন্তু ঋণ নিতে গিয়ে আর পরবর্তীকালে সেই ঋণ পরিশোধ করার হিসাবের বেলায় দেখা গেল, এই ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর স্বর্ণের মজুদ তলানিতে ঠেকেছে। এমতাবস্থায়, তাদের মুদ্রার বিপরীতে পর্যাপ্ত স্বর্ণ মজুদ রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

বিশ্বযুদ্ধের সেই সংকটের মধ্যেই স্বর্ণভিত্তিক মুদ্রাব্যবস্থা ধরে রাখার জন্য ১৯৪৪ সালে আমেরিকার নিউ হ্যাম্পশায়ার অঙ্গরাজ্যের ব্রেটন উডস নামক স্থানে ৪৪টা মিত্র দেশের মাঝে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, একমাত্র মার্কিন ডলারের বিপরীতে স্বর্ণ মজুদ থাকবে। অর্থাৎ, প্রতি ৩৫ ডলারের বিপরীতে ১ আউন্স স্বর্ণ মজুদ থাকবে এবং বাদবাকি সব মুদ্রার মান মার্কিন ডলারের বিপরীতে নির্ধারিত হবে। এই চুক্তির কারণে অন্য রাষ্ট্রগুলো তাদের মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণ মজুদ রাখার দায় থেকে মুক্তি পেল ও আমেরিকা ব্যতিত সব রাষ্ট্রের জন্য স্বর্ণের মজুদ ডলার

২৭ https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/economics/nixon-shock/

দ্বারা প্রতিস্থাপিত হল। অর্থাৎ, এই সিদ্ধান্তের প্রভাবে মার্কিন ডলারই হয়ে
দাঁড়ায় সোনার বিকল্প ও মার্কিন ডলার অচিরেই আন্তর্জাতিক 'রিজার্ভ কারেন্সি'
বা মজুদ মুদ্রাতে পরিণত হয়।

কিন্তু আমেরিকা তার কথা রাখেনি, বা মূলত রাখতে পারেনি। চুক্তির
সময়ে সোনার মজুদে ভরপুর আমেরিকা টের পায়নি, কত ধানে কত চাল।
বিশ্বযুদ্ধ শেষে, ভিয়েতনাম যুদ্ধ শুরু করল আমেরিকা, সেখানে যুদ্ধ করতে
বিপুল টাকা প্রয়োজন। এই টাকা আসবে কোথা থেকে? সহজ সমাধান হচ্ছে
নতুন নোট ছাপানো। সব মিলিয়ে ফেডারেল রিজার্ভ ডলার ছাপিয়ে ঋণ দিতে
থাকে[২৮] আর ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ ব্যাংকিং এর হাওয়াই টাকা তো আছেই।
এভাবে অতিরিক্ত মার্কিন ডলার ছাপানোর ফলে স্বর্ণের বিপরীতে ডলারের দাম
হু-হু করে পড়তে থাকে। এমনকি ১৯৭১ সালে মার্কিন ডলারের দাম প্রতি
আউন্স স্বর্ণের বিপরীতে ২০০ ডলারে নেমে আসে।

ডলারের এই পড়তি দামের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়োরোপের দেশগুলোর
অসন্তুষ্টি ক্রমাগত বাড়ে। সেসব দেশ তখন তাদের কাছে মজুদ থাকা ডলার
ভাঙিয়ে আমেরিকার কাছে স্বর্ণ দাবি করে বসে। ১৯৭১ সালের আগস্ট
মাসের শুরুতে তৎকালীন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট জর্জেস পম্পিদিউ ডলার
ভাংগিয়ে নিরাপদে সোনা নেওয়ার জন্য আমেরিকাতে একটি যুদ্ধ জাহাজ
পাঠান।

এর পরপরই আগস্টের ১১ তারিখ তৎকালীন ব্রিটিশ ট্রেজারি অনুরোধ
করে যে, আমেরিকা যেন ব্রিটেনের পাওনা ৩ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ স্বর্ণ
ফোর্ট নক্স থেকে আমেরিকার ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে নিয়ে রাখে। সেই
সময়ে আমেরিকা নিজের স্বর্ণ রাখত ফোর্ট নক্সে। আর অন্য দেশের স্বর্ণ
রাখত নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে। ব্রিটেনের অনুরোধ শুনে
আমেরিকার বুঝতে বাকি থাকে না, যেই ব্রিটেন ও ইয়োরোপকে বাঁচাতে
ব্রেটন উডস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, দুঃসময়ের আভাসে তারা আমেরিকার নিয়ন্ত্রণ
থেকে স্বর্ণ সরিয়ে নেয়ার পূর্ণপ্রস্তুতি সম্পন্ন করছে। সবার সার্বিক মতিগতি
দেখে, ১৫ই আগস্ট পৃথিবীকে হতভম্ব করে তৎকালীন মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড
নিক্সন স্বর্ণের মজুদ ব্যবস্থা বিলুপ্ত ঘোষণা করে দেন।[২৯]

---

২৮ তাছাড়া ব্যাংক ক্রেডিট মানি তো আছেই।

২৯ https://scholarship.law.columbia.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3545&context=faculty-scholarship

এই এক ঘোষণার ফলে, মার্কিন ডলার এবং তার সাথে সাথে পৃথিবীর সব মুদ্রা ফিয়াট কারেন্সিতে পরিণত হয়। অর্থাৎ, বর্তমান বিশ্বের কোন মুদ্রার বিপরীতে সমপরিমাণ মূল্যবান সম্পদ জমা রাখা নেই। মুদ্রা এখন নিজেই নিজের মূল্যমান।

মার্কিনিরা মুদ্রার মূল্যের সাথে মুদ্রার মূল্যমান আলাদা করতে সাহায্য করেছে মাত্র। কারণ, এই কাছাকাছি সময়েই একাধিকবার ব্যাংকে টাকা রেখে, সেই টাকার 'টোকেন' দেখিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচলন করার চেষ্টা করা হয়েছে। যুক্তি ছিল, মুদ্রা শুধুই 'বিনিময়ের মাধ্যম', এটাকে কেন 'মূল্যবান' হতে হবে? নিক্সন শক আসলে ঝাঁকি দিয়ে পুরো বিশ্বকে অদ্ভুত এই দর্শনের আওতায় নিয়ে চলে এসেছে।

অপরদিকে, সব দেশের অর্থনীতিই অতীতকালের তুলনায় মহীরূহে পরিণত হয়েছে। বাস্তবতা হলো, কোন ধাতব মুদ্রাই হয়তো বর্তমান কালের প্রয়োজনমাফিক পরিমাণে সরবরাহ নিশ্চিত করে চাহিদা সর্বাংশে পূরণ করতে পারতো না। তাই আজকে আমরা 'শুধু কাগজ' দিয়েই কাজ সারি। আর ধাতব মুদ্রা খুচরা পয়সা হিসেবে চলছে।

সূক্ষ্ম কৌশলে চুরি

বর্তমান যুগে টাকা কোথা থেকে আসে সেই তথ্য আমাদের হাতের মুঠোতেই আছে। আপনার হাতের নোটটির দিকে লক্ষ্য করলে এর গায়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট লেখা দেখতে পাবেন। অর্থাৎ, টাকা আসে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই টাকা উৎপাদন করে কীসের ভিত্তিতে?

প্রথম কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট বাজারে আসারকালে নিয়ম ছিল, কেউ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গিয়ে নোটের বিপরীতে চাইলেই সমপরিমাণ সোনা তুলে আনতে পারবে। অর্থাৎ, সোনার মজুদের ভিত্তিতে নোট তৈরি করা হয়েছিল।

এজন্য এখনো অনেকে মনে করেন, একালেও টাকার বিপরীতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গোপন কুঠুরিতে স্বর্ণ বা রৌপ্য রিজার্ভ আছে। চাইলেই, যে কেউ গিয়ে তা তুলে আনতে পারবে। এই ধারণার অন্তরালের ঘোরতর ভ্রান্তিটি আপনারা ইতোমধ্যেই নিক্সন শকের ইতিহাসের কল্যাণে জেনে গেছেন।[৩০]

---

৩০ বর্তমান যুগের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সোনার রিজার্ভ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।

খেয়াল করুন, প্রথমে সবাই নিজ নিজ সোনা ব্যাংকে রেখে তার বিপরীতে নোট হাতে পেল। তারপরে, এই সোনার বিপরীতে ব্যাংকাররা মিলে একটি সাধারণ নোট বাজারে আনলো। তখনো হাতের নোটের বিনিময়ে মানুষ সোনা তুলতে পারতো। কালে কালে, একদিন নোটের বিপরীতে সোনা তোলার বন্দোবস্ত বাতিল করে দেওয়া হল। এভাবে এক ফালি কাগজের বিনিময়ে ব্যাংক সব মানুষের জমাকৃত স্বর্ণ দখল করে নিল। এটাই হলো সূক্ষ্ম কৌশলে ব্যাংক কর্তৃক জনগণের সোনা চুরি করে নেওয়া।

স্বর্ণমজুদের ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর সব টাকা নিরেট কাগুজে মুদ্রা বা ফিয়াট মানিতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলেই মর্জিমতো টাকা ছাপাতে পারে। একটি ছাপাখানাতে যেমন যত ইচ্ছা তত কপি বই ছাপানো যায়, ঠিক তেমনি কেন্দ্রীয় ব্যাংকেও যত ইচ্ছা তত টাকা ছাপানো যায়। এই স্বাধীনতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আছে। এসব কাগজের টাকা ছাপানো যায়। এই স্বাধীনতা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আছে। এসব শুনতে উদ্ভট লাগলে বিচলিত হবেন না। কারণ, এই নিগূঢ় তত্ত্ব প্রথমবারে সবাইকেই হতভম্ব করে। তবে আপনি পায়ের নিচে মাটি খুঁড়ে পাবেন না আসল রহস্যপূর্ণ আরেকটা বিষয় জেনে যে, বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট = ঋণ এবং কোন ঋণ নাই মানে কোন টাকা নাই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থা

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কি এলোমেলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কাউকে টাকা দান করে? না, তা করে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আপনাকে, আমাকে কিংবা দেশের সরকারকে টাকা দান করে না। তাহলে কি করে? ঋণ দেয়। কাকে ঋণ দেয়? সরকারকে অথবা বাণিজ্যিক ব্যাংককে। পরবর্তীকালে এই ঋণের টাকা প্রতিষ্ঠানগুলো নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করলে, বাজারে নতুন টাকা প্রবেশ করে। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে সব 'প্রাথমিক' টাকার মালিক, যা আমাদেরকে শুধু ব্যবহার করার জন্য সে ধার দেয়। এই ব্যবস্থার মাঝে লুকিয়ে থাকা শুভংকরের ফাঁকিটা আপনাদের চোখে পড়েছে কি?

দেখুন, একটি অর্থনীতির সব টাকাই যদি ঋণ হিসেবে প্রবেশ করে, তাহলে সব ঋণ মহাজনকে বা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পরিশোধ করে দিলে দেশে কোন টাকাই থাকে না। আর টাকা ছাড়া যেহেতু একটি দেশ চলতে পারে না, এর মানে দাঁড়াচ্ছে কোন দেশই ঋণ থেকে মুক্ত হতে পারবে না। এই দুঃখজনক ব্যবস্থার দ্বিতীয় শুভঙ্করের ফাঁকিটা কি আপনাদের চোখে পড়েছে?

ভেবে দেখুন, কেবল ঋণ হিসেবে টাকা দেয়ায়, ঋণের মেয়াদশেষে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই টাকা সুদে-আসলে ফেরতও নিচ্ছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংক ছাড়া কেউ যদি টাকা ছাপাতে না পারে, এই ঋণের সুদ পূরণ হবে কোথা থেকে? ধরুন, পৃথিবীতে কেবলমাত্র আমিই হিরের মুদ্রা তৈরি করতে পারি। তাহলে, ১০টি হিরের মুদ্রা ধার দিয়ে এক বছরান্তে ১২টি হিরের মুদ্রা ফেরত চাইলে, নতুন দুটি মুদ্রা আসবে কোথা থেকে?

নিশ্চয়ই তা আমাকেই তৈরি করে ঋণ দিতে হবে।

ঠিক তেমনি, কেন্দ্রীয় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে ঋণ দেয়। পরবর্তীকালে, সব ঋণ সুদে-আসলে ফেরত চাইলে, সুদটা কোথা থেকে পূরণ হবে? উত্তর হচ্ছে, আমাদেরকে ব্যাংক থেকে পুনরায় বাড়তি ঋণ নিতে হবে। বাড়তি ঋণ নিলেই কেবল নতুন টাকা ছাপানো হবে। আর একমাত্র এভাবেই পুরোনো ঋণের সুদ পরিশোধ করা যাবে। এদিকে নতুন ঋণের উপর যেহেতু সুদ যুক্ত আছে, পরের বছর ততোধিক ঋণ নিয়ে সুদ পূরণ করতে হবে। অর্থাৎ, কোনদিনই এই আসল পরিশোধ সম্ভব না এবং মোট ঋণের পরিমাণ চক্রাকারে বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। তাই আমরা ঋণের উপর বেঁচে থাকব তো বটেই, কালক্রমে এই ঋণের বোঝা কেবল বাড়তেই থাকবে।

'if there were no debts in our money system, there wouldn't be any money.'

—Marriner Eccles

American banker, economist, and member & chairman of the Federal Reserve Board.

'আমাদের অর্থব্যবস্থায় ঋণ না থাকলে টাকার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।'

— মারিনার একলস

আমেরিকান ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদ এবং ফেডারেল রিজার্ভ বোর্ডের মেম্বার ও চেয়ারম্যান

বাণিজ্যিক ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থা

অতীতে, সোনার মোহর চালু থাকাকালে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো সোনার রিজার্ভের বিপরীতে কাগজের নোট ইস্যু করতো। কিন্তু বর্তমানে কেন্দ্রীয় ব্যাংকই সব কাগজের নোট ছাপাচ্ছে দেখে কি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মুদ্রা তৈরি বন্ধ করে দিয়েছে?

না, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো টাকা ছাপানো বন্ধ করেনি। তারা এখন ব্যাংক নোটের বিপরীতে ইস্যু করছে হাওয়াই টাকা। জি, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এখন কাগুজে নোটের বিপরীতে ক্রেডিট মানি বা হাওয়াই টাকা বাজারে ছাড়ছে (অনেকে একে ইলেক্ট্রনিক মানি বলে), ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেমের কল্যাণে। একসময়ের ইয়োরোপের স্বর্ণকারদের সেই অদৃশ্য স্বর্ণের বিপরীতে কিছু কাগজের নোট লিখে দেয়ার ধারাবাহিকতায়, বর্তমানে সারা বিশ্বের ব্যাংকগুলো টাকার বিপরীতে টাকা বা স্বর্ণ নয়, বরং কিছু ডিজিটাল ডিপোজিট লিখে দিচ্ছে। এই ব্যাপারটির কার্যকরী কৌশল নিচে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছি। তবে তার আগে দেখে নেই আধুনিক বিশ্বে মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট বা গুণোত্তর বৃদ্ধি কীভাবে কাজ করছে?

ধরুন, চীনের শেনজেনে অফিস খুলে আপনি একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করলেন। নাম তার 'ইও ছিয়ান' ব্যাংক। এখন শেনজেন শহরের ১১টি কর্পোরেশনের মধ্যে ১০টি কর্পোরেশন সেখানে ১০ মিলিয়ন করে সাকুল্যে ১০০ মিলিয়ন টাকা জমা দিল। তাহলে, কর্পোরেশনগুলোর হাতে মোট কত মিলিয়ন টাকা আছে? ১০টি কোম্পানিই বলবে ব্যাংকে তাদের যথাক্রমে ১০ মিলিয়ন করে টাকা আছে। অর্থাৎ, মোট ১০০ মিলিয়ন টাকা জমা আছে। জমাকারী কোম্পানি চাইলেই সেই মুদ্রা তুলে আনতে পারবে, ব্যাংক এই প্রতিশ্রুতিটিই দিয়েছে। তবে টাকা উত্তোলনের ভেজালের মধ্যে যাওয়া নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কারণ, এক অ্যাকাউন্ট থেকে অপর অ্যাকাউন্টে লেনদেন করেই সব কাজ সারা যায়। অর্থাৎ, টাকা ব্যাংকের ভল্টে জমা থাকুক কি হাতে থাকুক, সবমিলিয়ে সমমানের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে। তাই টাকা চাই যেখানেই থাকুক না কেন, কোন সমস্যা নেই। এদিকে আপনি ১১তম কর্পোরেশনকে মোট ৯০ মিলিয়ন টাকা ঋণ দিয়ে দিলেন। এবারে ১১তম কর্পোরেশনকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনাদের কত টাকা আছে?' উত্তরে তারা বলবে ৯০ মিলিয়ন টাকা আছে। এভাবে মোট টাকা হয়ে গেল ১৯০ মিলিয়ন। দুই ভাবে হিসেবের ফলাফল দুই রকম আসছে। তাহলে সমাজে প্রকৃতপক্ষে কত টাকা আছে?

আপনি টাকার সংজ্ঞা শক্ত ও ঋজুভাবে নির্ধারণ করলে, মোট টাকা আছে ১০০ মিলিয়ন। কিন্তু অর্থনীতিবিদগণ এই সংজ্ঞাটিকে পাত্তাই দেন না। কারণ, ব্যাংক ডিপোজিটকে বাস্তবে ডিপোজিটকৃত মুদ্রার প্রশ্নবিহীন বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাই একেবারে কাঁচা টাকাকে M0 এবং কাঁচা টাকা + ডিপোজিটকে একত্রে M1 এবং আরো বড় পরিসরে M2 ধরা হয়। ঠিক এভাবেই, একটি দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে আমরা টাকা রাখলে

এবং ব্যাংক সেখান থেকে কাউকে ঋণ দিলে, নতুন টাকা সৃষ্টি হয়। তাই, দেশে দেশে M0 এর তুলনায় M1 বা M2 সর্বদাই বেশি হয়।

এবার আসা যাক পরবর্তী ধাপে। পুনরায় শেনজেনে ফিরি। ঋণ নেবার পরে এগারোতম কর্পোরেশন ৯০ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করল। ফলে, টাকাগুলো অপরাপর নাগরিকদের হাতে হাতে ছড়িয়ে পড়ল। এবারে সদ্য হাতে পাওয়া টাকা নাগরিকেরা নিশ্চয়ই বাসার আলমারিতে বা খাটের নিচে রাখবে না। তারাও এই টাকা ব্যাংকে জমা দিবে। সবমিলিয়ে ৮০ মিলিয়ন টাকা ঘুরেফিরে পুনর্বার ব্যাংকে জমা পড়বে। ব্যাংক সেগুলো আবারো ঋণ দিয়ে দিবে। দেখা যাবে, ঘুরেফিরে ৭০ মিলিয়ন টাকা ফেরত। পরের বার, সেই মুদ্রা ব্যাংক আবার ঋণ দিতেই, ফের ৬০ মিলিয়ন জমা। এই চক্রটি চলতে থাকবে। এভাবে, হাত থেকে ব্যাংকে ও ব্যাংক থেকে হাতে ঘুরতে-ফিরতে টাকা বৃদ্ধি পাওয়াই 'মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট' হিসেবে পরিচিত।

মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট তো বুঝলেন। বিস্ময়করভাবে, আরো লাভজনক একটি উপায় হলো ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ বা আংশিক সঞ্চয়। খেয়াল করে দেখুন, উপরের বর্ণনা অনুযায়ী ব্যাংক ভল্টের থেকে কাঁচা টাকা তুলে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ দিয়ে সিন্দুক খালি করে ফেলছে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। স্বর্ণের যুগে স্বর্ণকার অলস স্বর্ণ সিন্দুকে রেখে তার বিপরীতে নতুন নতুন নোট লিখে দিত। ঠিক তেমনি বর্তমান যুগের ব্যাংকগুলোও অলস টাকার বিপরীতে নতুন ব্যালেন্স তৈরি করে গ্রহীতার অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে দেয়। সোজা বাংলায় ব্যাংক টাকা ছাপিয়ে ঋণ দেয় (ইলেকট্রনিক মানি)। যদি আপনি বা আমি টাকা ছাপাই তাহলে তা অবৈধ। কিন্তু ব্যাংক যদি একই কাজ করে তাহলে তা বৈধ! এ কারণেই ব্যাংক এত লাভ করতে পারে। তবে কতো পরিমাণ জমার বিপরীতে কী পরিমাণ হাওয়াই টাকা বা ক্রেডিট ব্যাংক সৃষ্টি করতে পারবে, তার একটি ঊর্ধ্বসীমা আছে। এই সীমা দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

এবারে আসুন, আধুনিক বিশ্বের আংশিক সঞ্চয় বা ফ্র্যাকশনাল ব্যাংকিংয়ের কর্মপদ্ধতির গভীরতায় প্রবেশ করি। বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বুঝতে আমরা একটি উদাহরণে যাই। চিন্তা করুন, বিকাশ ব্যাংকে একজন আমানতকারী ১০ লাখ টাকা জমা রাখল। অতঃপর, মোনেম গ্রুপ তাদের থেকে ১ কোটি টাকা লোন চাইলো।

সেই মোতাবেক ব্যাংকও এক কোটি টাকার ঋণ লিখে নির্মাণ ব্যবসায়ী মোনেম গ্রুপের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিল। এক্ষেত্রে, ১০ লাখ টাকার কোন নড়চড় হয়নি, ভল্টেই পড়ে থাকল। মাঝখান দিয়ে একইসাথে নতুন ৯০ লাখ টাকার জন্ম হল এবং ১ কোটি টাকার পুরোটাই সুদের উপর খাটানোর

প্রক্রিয়াও শেষ হয়ে গেল। এবার, মোনেম গ্রুপ বাড়ি নির্মাণের বালুর মূল্যটা বালু ব্যবসায়ীর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ইলেক্ট্রনিক ট্রান্সফার করে দিল।

এখন বালু ব্যবসায়ীর অ্যাকাউন্ট এবং মোনেম গ্রুপের অ্যাকাউন্ট ঘটনাক্রমে একই ব্যাংকে হয়ে থাকলে, কেবল নামের বিপরীতে নাম্বার অদল-বদল হবে। খেয়াল করলেই দেখবেন, হিসাবগুলোর সব টাকা হাওয়ায় ভাসছে। অথচ বালুর ব্যবসায়ী নিশ্চিত থাকবেন যে, টাকাটা তার অ্যাকাউন্টে জমা আছে। আর উনার মানসিকভাবে নিরাপত্তাবোধটা সুনিশ্চিত বিধায় টাকা তুলে হাতে রাখার প্রশ্নই আসে না। পরবর্তীকালে, তিনি নিজেও কেনাকাটা করার সময় ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে যাবেন না। বরং, চেকে লেনদেন করে অ্যাকাউন্টে অ্যাকাউন্টেই কাজ সেরে নিবেন। বালুর ব্যবসায়ী কিছু নগদ টাকা তুলে খরচ করলেও ব্যাংকের কোন সমস্যা নেই। সবাইতো আর একসাথে সব টাকা তুলছেন না। তাছাড়া, গ্রাহকের জরুরি প্রয়োজন মেটাতে কিছু টাকা সর্বদাই ভল্টে জমা থাকে। বাদবাকি সব টাকা অদৃশ্য। কেবল হিসেবের খাতায় নাম্বার টুকে রাখে এবং তার উপর সুদ আসতে থাকে।

সব গ্রাহক একসাথে ক্যাশ করলেই এই তাসের ঘরের মতো দুর্বল ও ভিত্তিহীন কাঠামোটা দুমড়েমুচড়ে যায়। মুহূর্তেই জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণসাপেক্ষে ব্যাংক নিজেকে বন্ধ ঘোষণা করে। যেমনটা হয়েছিল ২০১১ সালের গ্রিসে, ২০২০ সালের লেবাননে এবং ভবিষ্যতে হতে পারে আরো অনেক স্থানে।

একটু তলিয়ে ভাবলেই দেখবেন, ফ্র্যাকশনাল রিজার্ভ সিস্টেমের এই ভেলকি চালু রাখতে সবার অ্যাকাউন্ট একই ব্যাংকে থাকাটা বাধ্যতামূলক না। এক ব্যাংকে সবার অ্যাকাউন্ট থাকার মতোই একটি ব্যাংকিং সিস্টেম একত্রে কাজ করে। যেমন, সেভেন রিংস সিমেন্ট কোম্পানির অ্যাকাউন্ট রূপালী ব্যাংকে। সেক্ষেত্রে, মোনেম গ্রুপ সিমেন্ট কিনলে, বিকাশ ব্যাংক থেকে হিসাব ট্রান্সফার হয়ে তা রূপালী ব্যাংকে প্রবেশ করবে। আবার দেখা গেল, রূপালী ব্যাংকের একজন গ্রাহক জনতা ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট থাকা খামারির থেকে গরু কিনেছেন। তখন আবার কিছু টাকা জনতা ব্যাংকে চলে আসবে। এরপর হয়তো, জনতা ব্যাংকের একজন গ্রাহক বিকাশ ব্যাংকের একজন গ্রাহকের থেকে পণ্য কিনলেন। এভাবে দিনশেষে আন্তঃব্যাংক হিসাব কাটাকাটি হয়ে যাবে।

ছবির মতো সব হিসাব সমানে সমানে কাটাকাটি না হলেও কোন সমস্যা নাই। কারণ, একটি অর্থনীতিতে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে অসম পরিমাণে টাকা চালাচালি হতে থাকলেও, পুরো ব্যাংকিং ব্যবস্থার হিসাব সাকুল্যে একই থাকবে। এখানে, কোন ব্যাংকের জমা কমে গেলে, তা অপর ব্যাংকের জমাকে বৃদ্ধি করে। তাই, তারা নিজেদের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ হিসেবে টাকার লেনদেন চালু রাখে। এভাবে এক এক দিন এক এক ব্যাংকের

জমা কম-বেশি হতে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে স্বল্প সময়ের জন্য ঋণ লেনদেন চলতে থাকে। বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে ঋণের আদান প্রদানের এরূপ সক্রিয় মার্কেট পৃথিবীর সব দেশেই আছে (interbank lending market)। বাংলাদেশে এই মার্কেটের নাম 'কল মানি মার্কেট'। এই আন্তঃব্যাংক সুদের হার বা কল মানি রেট নীতি নির্ধারকদের জন্যে একটি গুরুত্বপুর্ণ অর্থনৈতিক ব্যারোমিটার।[৩১]

Multiplier Effect এবং Fractional Reserve আপনার মস্তিষ্কে একসাথে ধারণ করতে পারলে বুঝে যাবেন, ব্যাংকের ক্ষমতা কত প্রকার ও কী কী। আর হ্যাঁ, আগেই উল্লিখিত একটা বিষয় আবারো স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, Multiplier Effect এবং Fractional Reserve Banking এর সাথে সায়েন্স এবং টেকনলজির কোন সম্পর্ক নেই। সুন্দর করে হিসাব সংরক্ষণ করতে পারলেই, যেকোন কাঠামোতে এই পদ্ধতি চালু রাখা সম্ভব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কারসাজি

বর্তমান ব্যাংকব্যবস্থার সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে সবাই একসাথে টাকা তুলতে আসলে পুরো বব্যবস্থা ধসে পড়বে। তবে বাস্তবে সবাই একসাথে টাকা তুলতে আসে না দেখে এটি টিকে আছে। তারপরেও এমন ঘটনা অতীতে বহুবার ঘটেছে এবং জনগণকে তার চরম মূল্য দিতে হয়েছে। সেই থেকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জন্ম। এখন আমরা আলোচনা করবো বর্তমান বিশ্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পর্ক কি? ব্যাংকিং ব্যবস্থার আধুনিক ক্রাইসিসগুলো কী কী? এবং এমন ক্রাইসিস মোকাবেলা করতে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে?

তারল্য সংকট (Liquidity Crisis)

কখনো যদি এমন হয় যে, একটি অর্থনীতিতে সব ব্যাংক থেকে গ্রাহকরা একসাথে বেশি বেশি টাকা তুলছেন কিংবা অনেকেই ব্যাংকে টাকা আমানত রাখছেন না এমন ঘটনাকে বলে তারল্য সংকট (liquidity Crisis).

---

৩১ ব্যাংকিং সিস্টেমের 'কল মানি' রেট দেখলেই বুঝবেন এক ব্যাংক আরেক ব্যাংকে কত শতাংশ সুদে এই টাকা ধার দেয়। ঈদের সময় এই কল মানি রেট তুঙ্গে থাকে, কারণ গ্রাহকরা তখন টাকা তুলে নিতে ব্যস্ত।

ছোট আকৃতির তারল্য সংকট হলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এসে ব্যাংকিং সিস্টেমকে রক্ষা করতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে (যেমন সঞ্চয়পত্র কিনে) বাজারে টাকা প্রবেশ করাবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যিক ব্যাংককে সরাসরি ঋণ দিবে। এভাবে ব্যাংকিং সিস্টেমে টাকা ঢুকতে থাকবে এবং তারল্য সংকট কেটে যাবে। তবে এই সংকট সুবৃহৎ পর্যায়ে ঘটলে, যেমন সারা দেশে সবাই একসাথে টাকা তোলা শুরু করলে, কিছু করার থাকবে না। এমন পরিস্থিতিতে সব ব্যাংক প্রথমত নিজেকে বন্ধ ঘোষণা করে। এমন ঘটনাকে ইংরেজিতে বলে Bank Holiday. পরবর্তীতে ক্যাশ টাকা তোলার উপর সীমা আরোপ করে ব্যাংক ধীরে ধীরে সমাধানের চেষ্টা চালায়।

এই ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল এড়ানোর জন্য কী পরিমাণ ঋণের বিপরীতে একটি ব্যাংককে কী পরিমাণ তারল্য রাখতে হবে, তার সর্বনিম্ন সীমারেখা নির্ধারণ পূর্বক কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নীতিমালা প্রণীত থাকে। কোন ব্যাংকের তারল্য এই সর্বনিম্ন সীমার নিচে চলে গেলে উক্ত ব্যাংককে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে নির্দেশ দেওয়া হয়। এভাবে ব্যাংকিং রিস্ক একটি সীমার মধ্যে রাখা হয় এবং সম্পূর্ণ সিস্টেমে চেক এন্ড ব্যালান্স বজায় থাকে।[৩২] কেন্দ্রীয় ব্যাংক হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে ব্যাংকিং সিস্টেমের পৃষ্ঠপোষক। সেইসাথে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে, ব্যাংকিং নীতিমালা প্রণয়নে বাসেল কমিটি এবং মুদ্রাব্যবস্থা সচল রাখতে আইএমএফ কাজ করে যাচ্ছে।

পুঁজি ঘাটতি

এবারে আলোচনা করা যাক পুঁজি ঘাটতি (Capital Shortfall) নিয়ে। তারল্য সংকটের পাশাপাশি পুঁজির সংকটও একটি ব্যাংককে ধসিয়ে ফেলতে পারে। ব্যাংকের গ্রাহকরা নিয়তই ঋণ খেলাপ করতে থাকলে ব্যাংকের পুঁজি কমে যায়। কোন ব্যাংকের পুঁজি কমে শূন্য হলে ব্যাংকটি কার্যত দেউলিয়া হয়ে যায়।

ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করা যাক :

---

৩২ ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস শুরু হলে ঐ গাইডলাইন আর কাজের উপযোগী থাকে না, পুরো সিস্টেমই ঝুঁকির মুখে পড়ে যায়। সম্প্রতি কিছু দেশে যেমন লেবানন এবং গ্রীসে এমনটিই ঘটেছে।

সালমান খান একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ঋণ দিতে থাকল। ব্যাংকের পুঁজি ৪০০ কোটি টাকা থাকাকালে, খান সাহেব ১৩ জনকে ১০০ কোটি টাকা করে মোট ১,৩০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে রাখল। ঋণ বিফলে না গেলে এই ১,৩০০ কোটি টাকার পুরোটাই ফেরত আসবে। আর সাথে আসবে বাড়তি সুদও। কিন্তু ঋণ ফেরত না আসলে?

ধরা যাক, ব্যাংক যেই ১৩ জনকে ঋণ দিয়েছিল তাদের তিনজন ঋণখেলাপি করেছে। পরবর্তীকালে, সালমান খানের ব্যাংক তাদের থেকে কিছুই ফেরত পেল না। এই ৩০০ কোটি টাকা ব্যাংকের পুঁজি থেকে বাদ যাবে। সব মিলিয়ে পুঁজি কমে দাঁড়াবে ১০০ কোটি টাকায়। তার মানে আরো একজন গ্রাহক ঋণ খেলাপ করলেই ব্যাংক শেষ।

এই ঘটনায় তৎক্ষণাৎ অন্যান্য ব্যাংকের টনক নড়ে উঠবে। কেউ সালমান খানকে ঋণ দিতে উৎসাহী হবে না। এদিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে খান সাহেবের প্রতি নোটিশ আসতে থাকবে পুঁজির অনুপাত বৃদ্ধি করার জন্য।

প্রথম বছর শেষে, সালমান খান যদি ১০০ কোটি টাকা সুদ পান (সুদের হার ১০%), তাহলে তার পুঁজি বেড়ে দাড়াবে ১০০ + ১০০ = ২০০ কোটি টাকায়। ধরি, হারানো ক্ষতি পোষাতে তিনি ফের দুঃসাহসী হয়ে উঠলেন। যদি ব্যাংকের ঋণের অনুপাতের পুঁজির সর্বনিম্ন সীমা ৮% হয়, তিনি এর সদ্ব্যবহার করে আরো ১,৫০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে মোট ঋণের পরিমাণ ২,৫০০ কোটিতে উন্নীত করলেন। ৮% এর পূর্ণ ব্যবহার। এই বছর কোন ঋণ বিফলে না গেলে, সুদ আসবে ২৫০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, পুঁজি বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৪৫০ কোটি টাকা।[৩৩] এভাবে, পুঁজির অনুপাত বেড়ে হয়ে যাবে ১৮% এবং খুব দ্রুতই একটি ব্যাংকটি হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পাবে।

ব্যাংকের পুঁজি ২০০ কোটি টাকা এবং মোট ঋণ ২,৫০০ কোটি থাকাকালে, আরো দুইজন ঋণ খেলাপ করলে, ব্যাংকের পুঁজি ০ (শূন্যে) হতো। অর্থাৎ, ব্যাংকটি দেউলিয়া হয়ে যেত।

এমন সংকটকালে, প্রয়োজনবোধে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকার একটি ব্যাংককে উদ্ধার করতে পারে (বা সময় বাড়িয়ে দিতে পারে)। ইংরেজিতে যাকে বলে বেইল আউট (Bail Out)। ঋণ সঠিকভাবে ফেরত আসলে ব্যাংকটি খুব দ্রুতই এই পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সাধারণত, ব্যাংকের জন্য ফিরে আসাটাই তুলনামূলকভাবে সহজ। একবার চিন্তা করে দেখুন,

---

৩৩ এখন চাইলে, ব্যাংক মোট ৬২৫০ কোটি টাকা ঋণ দিতে পারবে।

২,৪০০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ১,২০০ কোটি টাকাও সুদ ছাড়া ফেরত আসলে ব্যাংক লালে লাল। আর এটি কেবল আসলের হিসেব, বাস্তবেতো আসলের পাশাপাশি সুদও আসবে।

এবারে আলোচনা করা যাক সর্বশেষ প্রেক্ষাপট নিয়ে। একটি ব্যাংক চূড়ান্ত পর্যায়ে দেউলিয়া হলে কি হবে। প্রথমত, ব্যাংকারদের পুঁজি শূন্য হয়ে যাবে। তবে বর্তমানে আমানতকারীদের ডিপোজিট রাষ্ট্র কর্তৃক বিমা করা থাকে। তাই সরকার ডিপোজিটরদের দায় আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে শোধ করে দেয়। এভাবে বর্তমান ব্যবস্থায়, সম্পূর্ণ জাতি ব্যাংকের অপরাধের দায়ভার বহন করে।

মনিটারি পলিসি

বর্তমান বিশ্বের মুদ্রাব্যবস্থার গাঠনিক কাঠামো অনুযায়ী, ঋণের উপরেই একটি জাতির ভাগ্য নির্ভরশীল। ঋণের চাকা দ্রুত ঘুরলে, সবার হাতে ক্রমান্বয়ে টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং নতুন নতুন বিনিয়োগ হতে থাকে। ঋণ বাড়লে, সবকিছু সুচারুরূপে চলতে থাকে। তবে ঋণ বাড়াতে বাড়াতে একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর ঋণ নেবার মতো যোগ্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন ঋণ গ্রহণের অযোগ্য ব্যক্তিদেরকেও (উচ্চ সুদের হারে) ঋণ দেওয়া হয়। ব্যংক অধিক ঝুঁকিপূর্ণ প্রজেক্টে বিনিয়োগ করলে দেউলিয়াত্বের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। এতদসত্ত্বেও, একটি সীমার পরে বেশি বেশি ঋণ দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠে (অর্থাৎ, নতুন টাকা তৈরির ধারাটাও স্তিমিত হয়ে আসে)। নতুন টাকার পরিমাণ কমে আসলেই, দেখা যায় পুরানো ঋণগ্রাহকেরা সুদ-আসল পরিশোধের টাকা জোগাতেই ব্যর্থ হয়। তার কারণ, ঋণ = টাকা। নতুন টাকা উৎপাদন ব্যতীত, পুরানো দেনা+সুদ শোধ হবে কীভাবে? তাই ঋণ সরবরাহ কমে গেলে, দেউলিয়াত্ব বেড়ে যায় এবং ডিফ্লেশন দেখা দেয়। এভাবে অর্থনৈতিক মন্দার অশুভ সূচনা হয়।

টাকার পরিমাণ কীভাবে কমে-বাড়ে এবং এর সাথে দেউলিয়াত্বের সম্পর্কের বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবে, সিংহভাগই তাদের নিঃস্ব হবার কারণ বোঝে না। কেউ নিজের ভাগ্যের দোষ দেয়, কেউ বা দোষ দেয় রাজনৈতিক মোড়লদের বা সরকারকে। তবে বাস্তবতা হচ্ছে, সুদভিত্তিক অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ (বা ঋণ) না বাড়লে, গাণিতিকভাবেই নির্দিষ্ট

সংখ্যক মানুষ দেউলিয়া হবে। দেউলিয়াটা কে হবে, শুধুমাত্র এই সিরিয়ালটাই অস্পষ্ট। কিন্তু ঠিক কী পরিমাণ মানুষ দেউলিয়া হবে, তা সুনির্ধারিত। এজন্য সুদে জর্জরিত একটি সমাজে রাতদিন টাকা নিয়ে কাড়াকাড়ি চলতে থাকে এবং কেউ এই রেসে পিছিয়ে পড়লেই, সে খাদে পড়ে যায়।

টাকা (বা ঋণ) হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে অর্থনৈতিক উৎপাদন বা জিডিপি সমন্বয়ের সংশ্লিষ্টতা ভালোভাবে বুঝতে, একটি দেশের অর্থনীতিতে দেউলিয়াত্বের প্রভাব দেখুন। এক্ষেত্রে, কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হলে, সেখানে কর্মরত লোকজন চাকরি হারায়। সমগ্র অর্থনীতিতে এই ধারা দেখা দিলে, বিশাল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন বসে থাকে। স্বভাবতই, এই কর্মহীন জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা কম বিধায় তারা কেনাকাটাও করে কম। এভাবে ক্রয়সীমা হ্রাস পেতেই, বাজার তার সবরকম ব্যবসার ক্রেতাদেরকে হারায়। আর ক্রেতা নিখোঁজ তো বেচা-বিক্রিও উধাও। তাই কোম্পানিগুলো লাগাতার লোকসানের মুখে পড়ে পথে বসার উপক্রম হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে প্রতিষ্ঠানগুলো বিরামহীনভাবে কর্মী ছাটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তাছাড়া ব্যবসায় লোকসান গুনতে কেউ বিনিয়োগ করে না। এভাবে বিনিয়োগের পরিমাণও শূন্যের কোঠোয় নেমে আসে এবং বেকারত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক দুষ্টচক্রের এই দৈন্যদশাকে দুই শব্দে বলা হয় 'অর্থনৈতিক মন্দা'। মন্দার বেষ্টনি থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে, ক্রমাগত ঋণ বৃদ্ধি করা। কারণ, নতুন ঋণ তৈরি হওয়া ছাড়া নতুনভাবে টাকা উৎপাদন হবে না। আর নতুন টাকা সৃষ্টি ব্যতীত পুরানো ঋণের সুদ পূরণ হবে না এবং দেউলিয়ার হিড়িকও ঠেকানো যাবে না। ঋণ বৃদ্ধি পাবার আরও উপকারি দিক হচ্ছে, সকলের হাতে হাতে টাকা আসবে, মোট বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতিও দ্রুত চাঙ্গা থাকবে।

টিকা - বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক ধসের একটি ২০০৭-০৮ সালে সংঘটিত হয়। আমেরিকা ছিল বিশ্বব্যাপী এই বিপর্যয়ের সূতিকাগার। সেবার শেয়ার মার্কেটের রেকর্ড পরিমাণ দরপতন ঘটে। বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান বন্ধের জেরে মার্কিন সরকার প্রায় ১ ট্রিলিয়ন ডলারের বেইল আউট প্যাকেজ

ঘোষণা করে। এই দৈবপাকের মোট ক্ষতি ধরা হয় প্রায় ২ ট্রিলিয়ন ডলার। প্রশ্ন হলো, এই অর্থনৈতিক ধসের সাইক্লোন কীভাবে সংঘটিত হলো?

২০০৭ সালের পূর্বে, আমেরিকার ব্যাংকগুলো অধিক সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতায় ঋণ নেওয়ার একেবারে অনুপযোগী ব্যক্তিদেরও গৃহ-ঋণ দিতে থাকে। গ্রাহকের দেউলিয়া হওয়া নিয়ে ব্যাংক তখন মোটেও চিন্তিত ছিল না। কারণ, ঋণের বিপরীতে কেনা বাড়িটি বন্ধক রাখা থাকত। কেউ দেউলিয়া হলেই ব্যাংক বাড়ির মালিকা! এদিকে, ফি-বছর বাড়ির ক্রমবর্ধমান মূল্যের কারণে গ্রাহক ঋণ পরিশোধ করুক কি দেউলিয়া হোক, উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাংকের লাভ থাকত। এই লোভনীয় হিসেবের পাঁকেচক্রে ব্যাংক কাউকে ঋণবিমুখ করতো না। এক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধে অসমর্থ ব্যক্তিরাও বাড়ি কেনার অনুমোদন পেতে লাগলো। ব্যাংক খুব খুশি। কারণ এটা লোকসানবিহীন ব্যবসা। গ্রাহকও খুব খুশি। কারণ যার কোন দিন নতুন বাড়ি করবার সামর্থ্য ছিল না, সেও একটি বাড়ি পেয়ে গেল।

এই ধারা চলতে চলতে এক পর্যায়ে সীমা অতিক্রম করে ফেলে এবং গণহারে গ্রাহকরা দেউলিয়া হওয়া শুরু করে। একসময় এত বেশি বাড়ির মালিক দেউলিয়া হয়ে পড়ে যে, বিক্রির লিস্টে বাড়ির সংখ্যা ক্রেতার সংখ্যার চেয়ে বেড়ে যায়। ক্রেতার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় আরেকবারের মতো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। বাড়ির দাম পড়ে যেতে শুরু করে। বাড়ির দাম পতনের সাথে সাথে ব্যাংকগুলোকেও লোকসান গুনতে হয়। ব্যাংকের পাশাপাশি বীমা কোম্পানিরও লোকসান শুরু হয়, কারণ ব্যাংক ঋণগুলো বিমা করা ছিল। এভাবে দেউলিয়াপনা আকাশ ছুঁলো এবং বেকারত্ব আরো বেশি বৃদ্ধি পেল। ফলশ্রুতিতে বাড়ির দামে তীব্রগতির অধঃপতনে বাজার দিশাহারা হলো।

ঘর বাড়ির দাম কমলে, ঋণী ব্যক্তিরা স্বেচ্ছায় দেউলিয়া হতে থাকে। কারণ ১ কোটি টাকার ঋণে ঘর কেনা শেষেই, তার ঘরের মূল্য যদি ৭০ লাখ টাকা হয়। অর্থাৎ, আপনি ১ কোটি টাকা দিয়ে ৭০ লাখের একটি বস্তু কিনে পরে ১ কোটি টাকার উপরে সুদ প্রদান করেন। তাহলে, আপনি ঘর বিক্রি করেও ঋণ পরিশোধ করতে পারবেন না। তাই এরকম ভূত-ভবিষ্যতবিহীন চুষে খাওয়া ঋণের খপ্পর থেকে বাঁচতে একমাত্র উপায়ই হলো দেউলিয়া হওয়া।

ক্ষতির পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতেই সুবৃহৎ একটি ব্যাংক দেউলিয়া হয়ে যায়, যার নাম লেহম্যান ব্রাদার্স। বিভিন্ন ডেরাইভেটিভের কারণে এই

ক্ষতি বাণের পানির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র এবং অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। দেখা দেয় দানবীয় এক মন্দা।
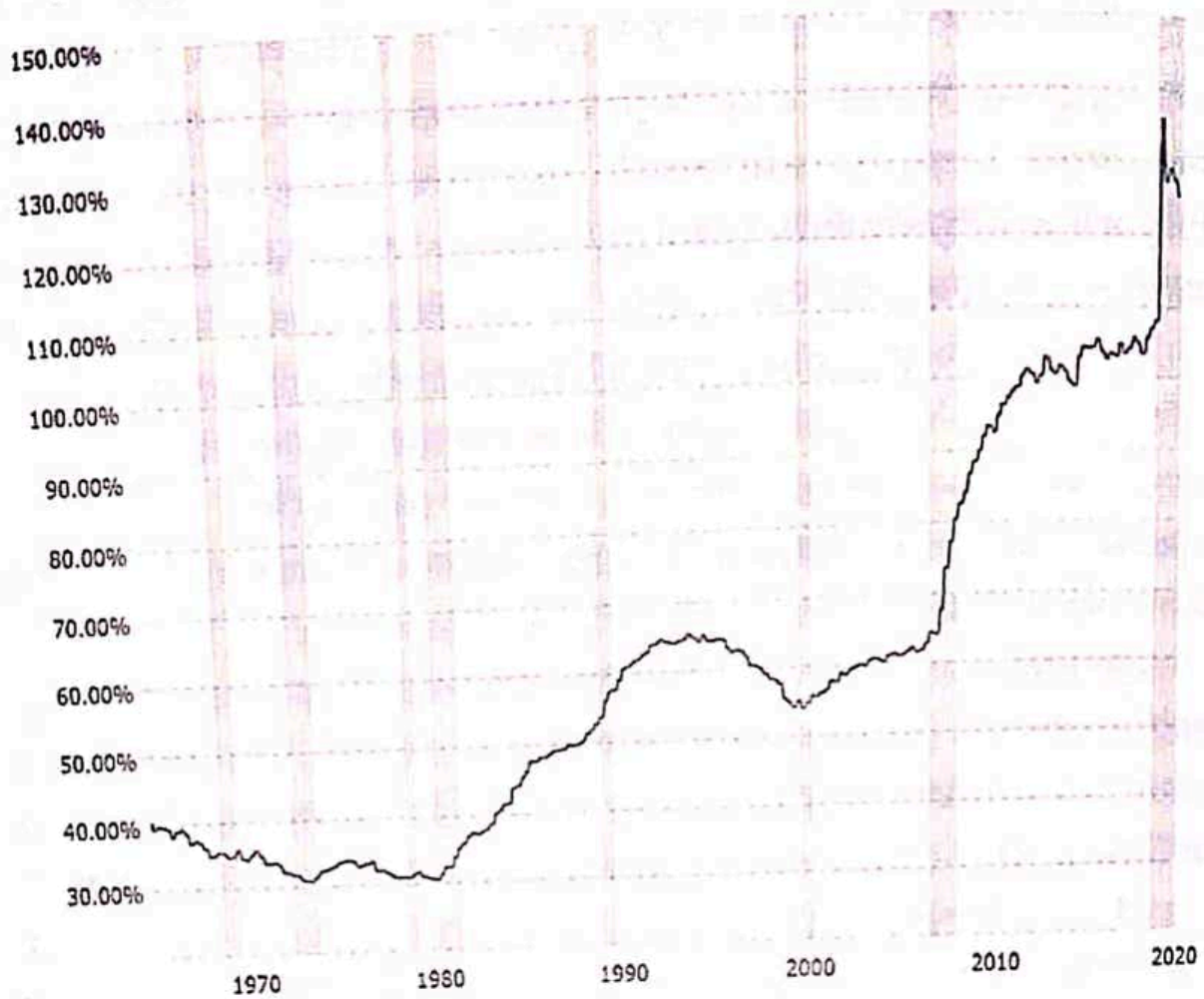
চিত্র - মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি'র তুলনায় শতকরা ঋণের হার[৩৪]

৩৪ https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S

টাকা ঋণের কারাগার

আমরা বলেছি টাকা উৎপাদন হয় ব্যাংকের মাধ্যমে। এই টাকা ঋণের আকারে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। তাই ঋণের পরিমাণগত বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনীতি চলবে না। উপরের চিত্রটি আমেরিকার জিডিপির তুলনায় সরকারি ঋণের গতিবিধিকে তুলে ধরেছে। সুস্পষ্টতই, এটি ক্রমান্বয়ে উপরের দিকেই উঠছে। তবে সময়ের সাথে অর্থনীতি বড় হলে, ঋণও বাড়বে। সেরকমটা ঘটলে চমকে উঠার কারণ নেই। কিন্তু এই চমৎকার কিন্তু ভয়াবহ চার্টটা মোট ঋণের প্রতিফলন না। এটি আমেরিকার জিডিপির তুলনায় শতকরা ঋণের হারের চার্ট। সোজা বাংলায়, ১৯৭০'র দশকে আমেরিকার মোট দেশজ উৎপাদনের মাত্র ৩০% সরকারি ঋণ ছিল। আর ২০২০'র দশকে সেটা ১৪০% ছাড়িয়ে যাচ্ছে! আবার ধরুন, ঋণের পরিমাণ মাঝে মাঝে কমেছেও। একটু খেয়াল করলে দেখবেন, চার্টে ছাইরঙা স্তম্ভ আঁকা আছে। এই স্তম্ভ সেই সময়ের অর্থনৈতিক মন্দার সময়কে নির্দেশ করছে। মোট ঋণের পরিমাণ কমে গেলে সাধারণত অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দেয়। সাথেসাথেই সরকার মন্দা ঠেকাতে আরো বেশি ঋণ নিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা করার চেষ্টা করে। সমস্যাটা আমেরিকার একার না, নিচের ছবিতে লক্ষ্য করুন। অধিকাংশ জি-২০ দেশের সরকারি ঋণের পরিমাণ জিডিপিকে ছাপিয়ে গেছে এবং এর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে।[৩৫]

আরো ভয়ানক তথ্য হলো, এই ছবিগুলো সম্পূর্ণ চিত্র তুলে ধরতে পারেনি! কারণ এতে বেসরকারি ঋণ যুক্ত করা হয়নি। একবার ভাবুন তো ঋণজালে কত গভীরভাবে জর্জরিত এই জাতি!

---

৩৫ https://data.oecd.org/gga/general-government-debt.htm
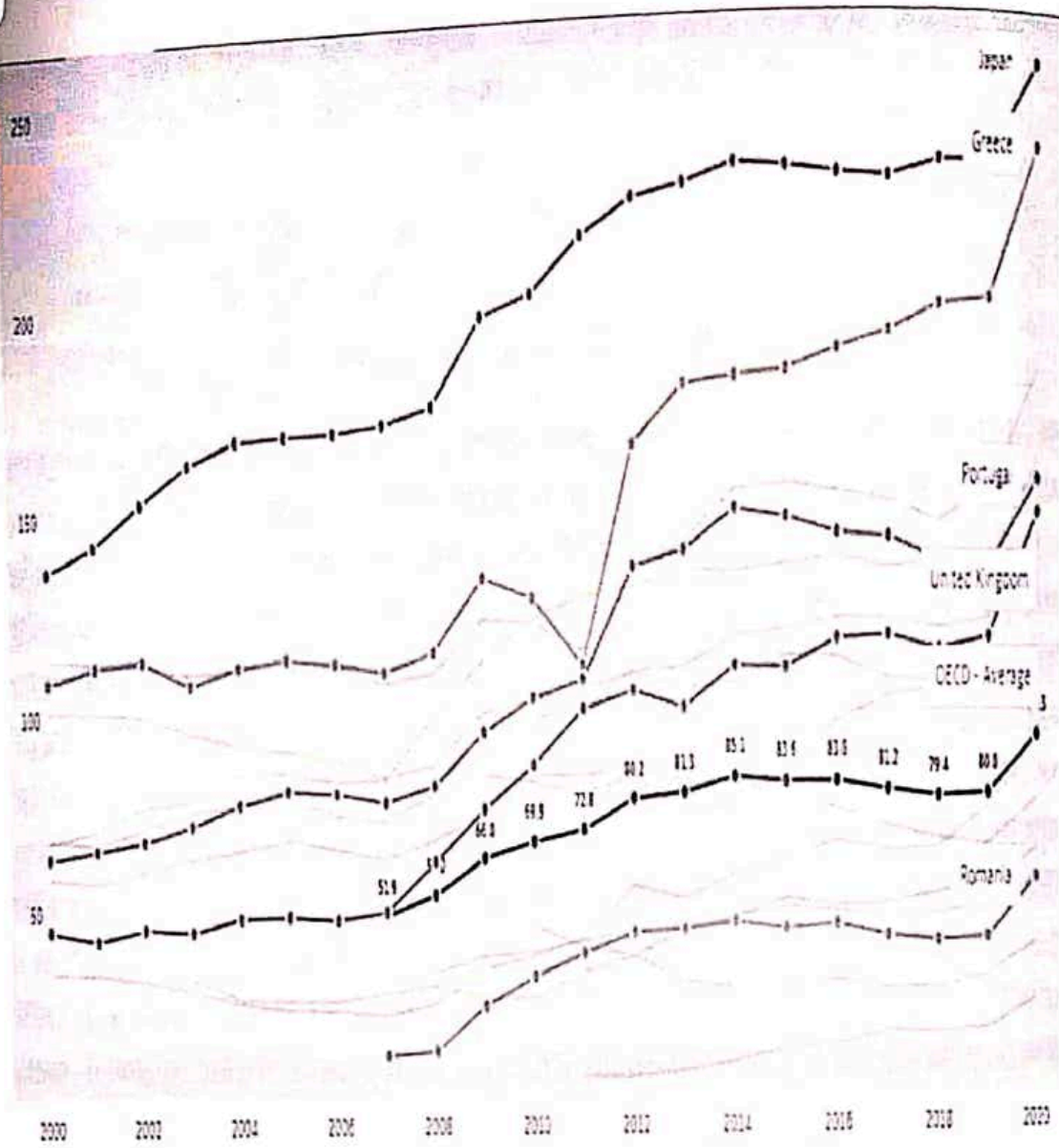
চিত্র - জি ২০ দেশসমূহের জিডিপির তুলনায় সরকারি ঋণ[৩৬]

ঋণ বৃদ্ধির উপকার অনস্বীকার্য। সব ব্যাংকই চায় মোট ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে, কিন্তু ঋণভারাক্রান্ত একটি সমাজে আরো ঋণ বৃদ্ধির উপায় কী? সবচেয়ে প্রচলিত উপায়টি হচ্ছে, সুদের হার হ্রাস করা। কোনো অর্থনীতিতে মন্দা ভাব দেখা দিলেই, সমস্যা সমাধানে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রথমেই সুদের হার হ্রাস করে। সুদের হার কিভাবে হ্রাস করা হয় তার বিস্তারিত আলোচনা এই বইয়ের সাধ্যের বাহিরে। তবে সংক্ষেপে বলতে গেলে নতুন টাকা ছাপিয়ে সহজে ঋণ দেয়ার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার হ্রাস করে। ইংরেজিতে যাকে বলে 'Monetary Easing' এবং আরো বড় পর্যায়ে 'Quantitative

৩৬ বোঝার সুবিধার জন্য বিচ্ছিন্ন পাঁচটি দেশ এবং ওইসিডি-র গড় ঋণের পরিসংখ্যান হাইলাইট করা হয়েছে। বাকি দেশগুলোর পরিসংখ্যান পেছনে দেখা যাচ্ছে।

Easing'. Monetary Easing বা Quantitative Easing এর ফলে নতুন টাকা অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। সুদের হার কম থাকলে ব্যবসায়ীরা কম খরচে বিনিয়োগ করতে পারে। এভাবে নতুন টাকা সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি বিনিয়োগের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, অর্থনীতিও চাঙ্গা হয়ে উঠে।

পরিস্থিতির উন্নতি হলে সুদের হার পুনরায় কিছুটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। সেইসাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিও হ্রাস পায়। সুদের হার হচ্ছে অনেকটা সঞ্চয়ের মতো। বিপদের দিনে যেমন সঞ্চয় কমে আসে হয়, ঠিক তেমনি মন্দার সময় সুদের হারও নগণ্য করা হয়। আর সুসময়ে আমাদের সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির মতোই অর্থনীতির ভালো সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার বৃদ্ধি করে।

এই পদ্ধতিটির নাম মনিটারি পলিসি বা মুদ্রানীতি, যার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হাতে রেখে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিতে উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। মনিটারি পলিসি মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব ফেলে না। এটি কেবলমাত্র সাময়িক প্রভাব বিস্তারকারী একটি প্রক্রিয়া মোট উৎপাদন নির্ভর করে প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ, ক্যাপিটাল এবং প্রযুক্তির উপর। মনিটারি পলিসি বা মোট টাকার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি, মোট উৎপাদনের কোন স্থায়ী নিয়ামক নয়।

'Whoever controls the volume of money in our country is the absolute master of all industry and commerce...when you realize that the entire system is very easily controlled, one way or another, by a few powerful men at the top, you will not have to be told how periods of inflation and depression originate.'

—James A. Garfield
20th President of the United States

'আমাদের দেশের শিল্প ও বাণিজ্যের আসল কর্তারা বিপুল অংকের অর্থ সরবরাহের ক্ষমতা রাখে। এই স্বল্পসংখ্যক ক্ষমতাধর ব্যক্তি কর্তৃক পুরো সিস্টেমটা দখলের কৌশলগুলো জানলেই, মূল্যস্ফীতি এবং মন্দা সৃষ্টির রহস্যগুলো আপনাকে আর ব্যাখ্যা করে বোঝানোর প্রয়োজন হবে না।'

—জেমস এ. গারফিল্ড
২০ তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি

'If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered.'

Thomas Jefferson (1743- 1826)
Founding Father & 3rd President of the USA

ফিসকাল পলিসি

মুদ্রানীতি ছাড়াও মন্দা ঠেকাতে ফিসকাল পলিসি বা সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই পলিসিতে সরকারি ভাতা ও অনুদান বৃদ্ধি, কর মওকুফ ও প্রণোদনা প্রদান করা হয়। এই পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করলে সরকারের আয় কমে যায় এবং ব্যয় বেড়ে যায়। অন্য কথায়, সরকার নিজেই ঋণ নিয়ে অর্থনীতিতে টাকা ছিটিয়ে দেয়। এভাবে মানুষের হাতে হাতে নতুন টাকা প্রবেশ করে। উদাহরণস্বরূপ— সরকার নতুন রাস্তাঘাট তৈরি করলে শ্রমিকদের বেতন এবং কাঁচামাল ক্রয় বাবদ নতুন টাকা অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। আবার, বেকারদের অনুদান দিলে তা বেকারভাতা রূপে অর্থনীতিতে প্রবেশ করে। মানুষের হাতে টাকা আসলে, তা খরচের ভেতর দিয়ে অর্থনীতিতে মোট ব্যয় বৃদ্ধি পায়। ক্রেতাদের ব্যয় বাড়লে বাজারে বেচাকেনা চড়া থাকে। এভাবেই ব্যবসাগুলো লাভের মুখ দেখে। বেচা-বিক্রির বিস্তার হলে ব্যবসায়ীরা নতুন কর্মী নিয়োগ দেয় এবং নতুন প্রজেক্টে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। সব মিলিয়ে অর্থনীতি প্রাণ ফিরে পায় ও বেকারত্বও কমে যায়।

বিনিয়োগ, ভাতা বৃদ্ধির সাথে সাথে মন্দার সময় ট্যাক্স কর্তনও করা হয়। ট্যাক্স কমালে ভোক্তাদের হাতে বেশি টাকা থাকে এবং অতিরিক্ত কেনাকাটা করে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতেও টাকা বেশি থাকে। তাদের এই টাকা তারা খরচ বা বিনিয়োগ করে। এভাবে অর্থনীতি গতি ফিরে পায়।

অর্থনীতি চাঙ্গা হলে, বেশি বেশি ট্যাক্স আদায় করে সরকার ঋণ শোধ করে দিবে— এমনটাই নিয়ম। তবে এই পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ খুব কম। সাধারণত সরকার ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে না, বরং দুঃসময়ে ঋণ বেশি নেয় এবং সুসময়ে ঋণ কম নেয়। কারণ, সুদের হার জিডিপি বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম হলে, ঋণের বোঝা কোনো সমস্যা না।

মনে করুন, আপনার কাঁধে একটি বোঝা আছে, এর ওজন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু একই সময়ে আপনার শক্তিও ক্রমাগত প্রবলতর হচ্ছে। এমতাবস্থায়, ধীরে ধীরে বোঝাটি হালকা মনে হবে। তেমনি করে সরকারের (বা রাজ্যের) জিডিপি বছর বছর ৫ শতাংশ, আর সুদ ৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেলে দিনে দিনে ঋণের বোঝা হালকা হবে। তাই চলমান ট্যাক্সের হারেই সব ঋণ সুদে-আসলে পরিশোধ করার পাশাপাশি উন্নয়ন ব্যয়ও খানিকটা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয়ত, জিডিপি'র উল্লম্ফন দৃশ্যমান উন্নয়ন সাধন করে। মানুষের জীবন যাপনে এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সেই তুলনায় ঋণের হিসাব-নিকাশ দৃশ্যমান না। আমরা খালি চোখে তা দেখতে পারি না। সেকারণে সরকার ঋণ কমানোর মতো কষ্টকর সিদ্ধান্ত এড়িয়ে জিডিপি বৃদ্ধির দিকেই মনোযোগী হয়ে থাকে। তাছাড়া, ঋণ শোধ করলে অর্থনীতিতে টাকার পরিমাণ কমে আসে। তাই অত্যধিক শক্তিশালী অর্থনৈতিক অগ্রগতি ছাড়া কেউ ঋণ পরিশোধের চিন্তাও করে না।

উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে, ফিসকাল ও মনিটারি পলিসি দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থনৈতিক দুঃসময়কে দূরে সরিয়ে রাখা যায়। কিন্তু ঘটনাক্রমে প্রবৃদ্ধির হার কমে আসতেই, সব বালির বাঁধের মতো ভেঙে পড়ে। কারণ :

১. জিডিপির বৃদ্ধির হার সুদের হারের চেয়ে কমে গেলে, ক্রমাগত ঋণের বোঝা ভারী হয়ে যায়। তাই সরকারকে ট্যাক্সের হার বৃদ্ধি করতে হয় অথবা ঋণ বেশি নিতে হয়।

২. এমতাবস্থায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার কমাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে (বর্তমান জাপান, ইয়োরোপ, আমেরিকা)। তবে সুদের হার কমানোর জন্য প্রচুর টাকা ছাপাতে হয়। এই পলিসি দেশের জনগণের জন্য মোটেও কল্যাণকর না। তাছাড়া সুদের হার কমানোর একটি সীমা আছে। কমাতে কমাতে একবারে শেষপ্রান্তে পৌছালে, আর বেশি কিছু করার থাকে না।

৩. সরকারের ঋণ বৃদ্ধিরও সিলিং আছে। ঋণের বোঝা বাড়লে, ক্রেডিট রেটিং খারাপ হতে থাকে এবং সুদের হার বৃদ্ধি পায়। তখন ঋণ পাওয়া ও নেওয়া উভয়ই কঠিন হয়। এমনকি এক পর্যায়ে সরকারও নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করতে পারে, যা অর্থনীতিকে গভীরভাবে ধসিয়ে দেয় (সম্প্রতি লেবাননে এবং অতীতে গ্রিস ও আর্জেন্টিনায় এমনটি হয়েছে)। অর্থাৎ, সরকার অনন্তকাল ঋণ নিয়ে অর্থনীতি চাঙ্গা রাখবে, সেই স্বপ্নের আশায় গুড়ে বালি।

'Anyone who believes exponential growth can go on forever in a finite world is either a madman or an economist.'

—Kenneth E. Boulding
English-born American economist & educator

'সসীম বিশ্বে কোন চক্রাকার বৃদ্ধি অনন্তকাল চলতে থাকবে, এমন মনে করা ব্যক্তি হয় পাগল নতুবা অর্থনীতিবিদ।'

— কেনেথ ই. বৌল্ডিং
আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ

সব মিলিয়ে ফিসকাল পলিসি এবং মনিটারি পলিসি উভয়ই ঋণের বোঝা হরদম বাড়িয়ে ভবিষ্যতের জন্যে ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। তাই যে পলিসিই চলুক না কেন, ফলাফল একটাই। আমরা সবাই ঋণ দাসে পরিণত হব। 'বর্তমান মুদ্রাব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সুদমুক্ত সমাজ গঠন' ছাড়া সেই পরিণতি ঠেকানোর কোন উপায় জানা নেই।

শেষ কথা

আমাদের চতুর্দিকে আধুনিক অর্থনীতি ও উন্নয়নের আড়ালে কৌশলে বুনে চলা যে সুবিশাল জাল রয়েছে সেই গুপ্ত মুখোশটিকেই এই বই উন্মোচন করল। চেনাজানা ও গা-সওয়া বিষয়গুলোর চক্রব্যূহের অন্তরালে সুনামির মতো এগিয়ে আসা পদধ্বনিকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হল। এখন আপনি চাইলে—

- সব ভুলে গিয়ে পুনরায় অতীত জীবনে ফিরে যেতে পারেন
- জেনে-বুঝেও কিছুই পরিবর্তন না করে শুধু জ্ঞানটা নিজের ভেতরে রেখে কবর পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারেন
- আলোকিত সমাজ গড়ায় ভূমিকা পালন করতে পারেন।

তৃতীয় পন্থাটি অবলম্বন করা ছাড়া, অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। আমরা রাতারাতি সব বদলে দিতে পারব না দেখে, হাত পা গুটিয়ে বসেও থাকতে পারি না। তাৎক্ষণিক সফলতা বা বিফলতার চেয়েও গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে, আমরা কি চেষ্টা করলাম? নাকি আপসেই পরাজয় মেনে নিলাম? তাই ভয়ে পিছপা না হয়ে আন্তরিকভাবে সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব, সবার নিকট এই প্রত্যাশা রইল।

খুব ছোট দুইটি সংগৃহীত ও পরিমার্জিত গল্প দিয়ে বইটি শেষ করছি।

ঈগল ও মোরগ

অনেক অনেক উঁচু এক পর্বতের চূড়ায় এক জোড়া ঈগল বাসা বানিয়েছিলো। সেই বাসায় ছিলো সদ্য পাড়া চারটি ডিম। প্রতিদিন সকালে তারা এগুলো রেখে খাবারের খোঁজে উড়ে যেত।

একদিন ঈগলরা যখন বাসার বাইরে ছিলো তখন ভূমিকম্পে গোটা পাহাড় নড়ে উঠলো। এতে ঈগলের একটি ডিম বাসা থেকে পড়ে গড়াতে গড়াতে এসে পড়লো পাহাড়ের নিচের এক মুরগির বাসায়।

মুরগি সেই ডিমটিকে নিজের মনে করে তার অন্যান্য ডিমের সাথে রেখে যত্ন করে তা দিতে থাকলো। একদিন সেই ডিম ফুটে ঈগলের একটি সুন্দর বাচ্চাও বের হলো। মুরগির বাচ্চাদের সাথেই ঈগলের বাচ্চাটি বড় হয়ে উঠতে লাগলো।

বাচ্চাটি মুরগি মায়ের শেখানো কথায় সবকিছুই মুরগিদের মতোই করত। কিন্তু সে ভেতর থেকে অন্য কিছু অনুভব করতো। আকাশে একদিন ঈগল উড়তে দেখে সে মুরগি মাকে বললো, 'ইস! মা, যদি আমিও তাদের মতো উড়ে বেড়াতে পারতাম! মুরগি মা হেসে উত্তর দিলো, তুমি কীভাবে উড়বে? তুমি তো মুরগি এবং মুরগিরা কখনো উড়ে না।

ঈগল মাঝে মাঝেই তার স্বগোত্রীয়দের উড়ে বেড়াতে দেখতো এবং স্বপ্ন দেখতো সেও তাদের মতোই উড়ে বেড়াবে। কিন্তু প্রতিবার সে এইকথা জানালে মুরগি পরিবার বলতো যে, এটা একেবারেই অসম্ভব। ঈগল সেটাই বিশ্বাস করতে শিখলো এবং তার বাকি জীবনটা মুরগিদের মতোই কাটিয়ে দিলো। এভাবে একদিন সে মারাও গেল।

এটা আসলে আমাদের অনেকের জীবনের এটা চরম সত্য। আমরা নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য কিংবা সক্ষমতা সম্পর্কে জানি না এবং জানার চেষ্টাও করি না। তাই, কখনো যদি ঈগলের মতো উড়ার স্বপ্ন দেখ, মুরগির কথায় কান দিতে যাবে না।

এক হাজার আয়নার ঘর

রূপকথার গ্রামের নদীর ধারে একটি ঘর ছিল যার নাম 'এক হাজার আয়নার ঘর'।

তার পাশের গ্রামে সুন্দর হাসি মাখা মুখের একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল যার নাম তার সুবর্ণা। সুবর্ণা সবসময় তার বাবা মা'র মুখে আয়নার ঘরের গল্প

শুনেছে কিন্তু কখনো তা দেখেনি। একদিন সে চিন্তা করল যে ঐ আয়নার ঘর দেখতে যাবে। কিন্তু একা একা যেতে সাহস না হওয়ায় তার সমবয়সী বান্ধবী অপর্ণাকে সাথে নিল। সুবর্ণার মত অপর্ণাও কখনো আয়না ঘর দেখেনি। আয়না ঘরের সামনে এসে তারা ঠিক করল সুবর্ণা আগে ঐ ঘরে ঢুকবে এবং সবকিছু দেখে বের হয়ে আসার পর অপর্ণা ঢুকবে।

সেই কথামতো সুবর্ণা ঐ ঘরের ভেতর ঢুকলো। ঘরে ঢুকেই তার চোখ ছানাবড়া। সে দেখলো ঠিক তারই মতো একহাজার হাস্যোজ্জ্বল মেয়ে মিষ্টি মুখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সে যা করছে বাকিরাও ঠিক তাই তাই করছে।

সব কিছু দেখে সে অনেক মজা পেয়ে বাইরে চলে এল এবং তার সাথী অপর্ণাকে বলল 'এমন সুন্দর জায়গা আমি আগে কখনো দেখিনি। আমার মত এক হাজার মেয়ে দেখা যায়। সবাই কত হাসিখুশি! সুযোগ পেলেই আবার এই জায়গায় চলে আসবো।'

সুবর্ণার বর্ণনা শুনে অপর্ণার মনে শংকা জাগলো, 'এই ছোট্ট ঘরে এক হাজার মেয়ে! ব্যাপারটা অস্বাভাবিক'। তাই কিছুটা ভয়ার্ত মন নিয়েই সে 'এক হাজার আয়নার ঘর'-এ প্রবেশ করল। ঘরে ঢোকার সাথে সাথে অপর্ণা আরো ভয় পেয়ে উঠলো। সে খেয়াল করল ঠিক তারই মতো এক হাজার ভয়ার্ত মেয়ে সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অপর্ণা বলল— 'তোমরা কারা?' সাথে সাথে বাকি এক হাজার মেয়েও ওর দিকে তাকিয়ে মুখ নাড়ল কিন্তু কোন শব্দ করল না! এবারে অপর্ণা আরো ভয় পেয়ে ঘর থেকে দৌড়ে বের হয়ে এল এবং সুবর্ণাকে বলল, 'শিগগিরই বাড়ি চল, এটা খুব বাজে জায়গা। আমি আর কোনদিন এখানে আসব না।'

আপনার জীবনটাও এই আয়না ঘরের মতো। আপনি যেভাবে জীবনকে দেখবেন, সেও ঠিক সে ভাবেই আপনার কাছে ধরা দিবে। সাহসিকতা, ভালোবাসা এবং জয় করার অদম্য ইচ্ছা নিয়ে যারা সামনে এগিয়ে যায়, জীবনও তাদের কাছে সম্ভাবনাময় হয়ে ধরা দেয়। আর আতঙ্কিত ও ভয়ার্ত ব্যক্তির কাছে সবকিছু কঠিন এবং সম্ভাবনাহীন রূপেই প্রতিভাত হয়।

আল্লাহ আপনার আমার জীবনকে বরকতপূর্ণ করে দিক, উত্তম মানসিকতা এবং উত্তম অর্থনৈতিক জীবন দান করুন। আমিন।

শব্দকোষ ও প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা

জিডিপি (GDP)

একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে (যেমন— এক বছরে) কোন অঞ্চলের ভেতরে উৎপাদিত সব পণ্য ও সেবার মোট বাজারমূল্যকে স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বা জিডিপি বলে। জিডিপি একটি অঞ্চলের অর্থনীতির আকার নির্দেশ করে। বিবেচ্য অঞ্চলটি যদি একটি দেশ হয়, তবে একে মোট দেশজ উৎপাদন নামেও ডাকা হয়।

জিডিপি = ভোগ + বিনিয়োগ + সরকারি ব্যয় + (রপ্তানি – আমদানি)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth or GDP growth)

একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে অঞ্চলের ভেতরে সব পণ্য ও সেবার মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হারকে সেই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বলা হয়।

উদাহরণ— ময়না দ্বীপের সবে মিলে গত বছর উৎপাদন করেছেন ১০০ কোটি টাকার পণ্য ও সেবা। এই বছর দ্বীপের মোট উৎপাদন হচ্ছে ১১০ কোটি টাকার পণ্য ও সেবা। তার মানে, এই বছর ময়না দ্বীপের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি (Inflation)

একটি অর্থনীতিতে সব ধরনের পণ্য ও সেবামূল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে মূল্যস্ফীতি বলে।

মূল্যহ্রাস (Deflation)

একটি অর্থনীতিতে সব ধরনের পণ্য ও সেবার মূল্য কমে যেতে থাকলে তাকে মূল্যহ্রাস বলে।

মুদ্রাস্ফীতি (Increase in Money Supply)

কোন অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধিকেই মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতি এবং মূল্যস্ফীতি উভয়ই খুব নিবিড়ভাবে জড়িত। কারণ কোন অর্থনীতিতে মুদ্রার সরবরাহ সব পণ্য ও সেবার সরবরাহের তুলনায় বেড়ে গেলে মূল্যস্ফীতি ঘটে। অর্থনীতিবিদ কেমারার (Kemmerer) এর মতে, 'যখন দেশে মোট মুদ্রার জোগান চাহিদার তুলনায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পণ্যসামগ্রীর দাম বৃদ্ধি করে তখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে।'

মনিটারি পলিসি (Monetary Policy)

মূল্যস্ফীতি, সুদের হার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেই দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা গৃহীত পরিকল্পনাকে বলা হয় 'মনিটরি পলিসি' (Monetary Policy)।

ফিসকাল পলিসি (Fiscal Policy)

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, বেকারত্ব হ্রাসের লক্ষ্যে সরকারের দ্বারা গৃহীত অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলিকে বলা হয় 'ফিসকাল পলিসি' (Fiscal Policy)।

দেউলিয়া (Bankruptcy)

কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন পাওনাদারের ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে, এ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া হিসেবে গণ্য করা হয়।

সুদ (Interest)

ঋণদাতা মূল যে পরিমাণ অর্থ ধার দিয়েছে, তার তুলনায় বাধ্যতামূলক বাড়তি (বা কম) অর্থ ফেরত চাইলে, এই ফেরত চাওয়া বাড়তি (বা কম) অংশকেই সুদ বলে।

ঋণদাতা যখন ঋণগ্রহীতা থেকে বাধ্যতামূলক বাড়তি আদায় করেন তখন ঋণদাতা হচ্ছেন সুদ ভক্ষণকারী।

ঋণগ্রহীতা যখন ঋণদাতাকে বাধ্যতামূলক কম প্রদান করেন তখন ঋণগ্রহীতা হচ্ছেন সুদ ভক্ষণকারী।

ব্যবসা (Business)

ব্যবসা বলতে সেই সংগঠনকে বুঝায়, যা অর্থের বিনিময়ে ভোক্তাকে পণ্য বা সেবা কিংবা, দুটো সুবিধাই প্রদান করে।

সুদের সাথে ব্যবসার একটি মৌলিক পার্থক্য হচ্ছে, ব্যবসায় দুটি ভিন্ন পণ্য লেনদেন হয় কিন্তু সুদে একই পণ্য কম-বেশি লেনদেন হয়।

চক্র বৃদ্ধি বা সূচকীয় বৃদ্ধি (Exponential Increase)

সময়ের সাথে সাথে কোন বস্তুর বৃদ্ধির পরিমাণ পূর্ব পরিমাণের সমানুপাতিক হলে, ঐ বৃদ্ধিকে চক্র বৃদ্ধি বলে। যেমন একটি দেশের জনসংখ্যা বছরে ১০% বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে দেশের মোট জনসংখ্যা ১ কোটি হলে এক বছর পরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হবে ১ কোটি দশ লাখ, দুই বছরে হবে ১ কোটি ২১ লাখ, তিন বছর পরে ১ কোটি ৩৩ লাখ। এভাবে প্রতি বছর মোট জনসংখ্যার পরিমাণ অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকবে থাকবে।

চক্রবৃদ্ধিকে নিম্নের ফাংশন দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে,

y=(1+r)^t এই ফাংশনে : হচ্ছে সময় এবং r হচ্ছে বৃদ্ধির হার।

দীর্ঘ দশ বছর দেশে-বিদেশে অধ্যয়ন শেষে মোহাইমিন পাটোয়ারী বর্তমানে অর্থনৈতিক বিশ্লেষক হিসেবে দায়িত্বরত আছেন। ২০১৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে বিবিএ সম্পন্ন করে তিনি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক 'চার্টার্ড ফাইনান্সিয়াল এনালিস্ট' প্রোগ্রামে যুক্ত হন। অর্থনীতি এবং ফাইনান্সের পাশাপাশি গণিতের প্রতি রয়েছে তাঁর ঝোঁক। সিএফএ অধ্যয়নরত অবস্থায় দ্বিতীয় স্নাতক প্রোগ্রামের জন্য তিনি গণিত বিভাগে নাম লেখান উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ২০১৬ সালে স্নাতকোত্তর গণিত অলিম্পিয়াডে বাংলাদেশের সেরা দশে অবস্থানের পুরস্কার অর্জন করেন। ২০১৭ সালের জুন মাসে তিনি সিএফএ পরীক্ষার তৃতীয় এবং শেষ ধাপ সম্পন্ন করেন।

তাঁর জীবনের ক্ষুদ্র একটি অপূর্ণতা হচ্ছে গণিতে স্নাতক সম্পন্ন করতে না পারা। স্নাতক করা অবস্থাতেই নরওয়ে স্কুল অফ ইকনমিক্সে মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য তার ডাক পড়ে। সেই ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি নিশীথ সূর্যোদয়ের দেশে পাড়ি জমান। অতঃপর নরওয়ে স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে দ্বৈত মাস্টার্স প্রোগ্রামের জন্য তিনি যন্ত্রের দেশ জার্মানির স্বনামধন্য 'মানহাইম বিশ্ববিদ্যালয়ে' পড়তে যান। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা, ভ্রমণ, শিক্ষকতা এবং ভাষা শিক্ষার জগতেও তিনি একজন সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। ২০১৮ সালে চাইনিজ ব্রিজ কম্পিটিশনে জাতীয় পর্যায়ে তৃতীয় স্থানসহ খেলাধুলার জগতেও রয়েছে তাঁর একাধিক পুরস্কার।

বর্তমানে অর্থনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বাংলা ভাষায় অর্থনীতির জগতকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। বই লেখার পাশাপাশি সংবাদপত্রেও তিনি নিয়মিত কলাম লিখেন। সরল বাংলায় এবং গল্পের ভঙ্গিমায় তাঁর লেখাগুলো ইতোমধ্যেই পাঠকদের মন কেড়ে নিয়েছে।